মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

থানভী রহিমাহুল্লাহ এর আরোপিত দু'টি শর্ত থেকে সৃষ্ট সংশয় ও তার নিরসন

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

থানভী রহিমাহুল্লাহর আরোপিত দুটি শর্ত থেকে সৃষ্ট সংশয় ও তার নিরসন

[পরিমার্জিত সংস্করণ]

রচনা

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনা

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة

উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

থানভী রহিমাহুল্লাহর আরোপিত দুটি শর্ত থেকে সৃষ্ট সংশয় ও তার নিরসন

[পরিমার্জিত সংস্করণ]

রচনা

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

- **প্রথম প্রকাশ**
  রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরী
  এপ্রিল ২০২০ ইংরেজি

- **দ্বিতীয় প্রকাশ**
  জিলহজ ১৪৪৭ হিজরী
  জুন ২০২৬ ইংরেজি

- **স্বত্ব**
  সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত

- **প্রকাশক**
  উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
  আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
  ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org
  ইমেইলঃ ask@fatwaa.org
  ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwa.org
  টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1
  ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org
  টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, বা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হল, কোন অবস্থাতেই বইয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

- কর্তৃপক্ষ

সূচিপত্র

থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর একটি উক্তি.....৮

দুটি বক্তব্য ও তার মূল্যায়ন ১০

থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর আলোচিত শর্ত দুটি ১২

মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের বিশ্লেষণ: ১৪

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা বিষয়ে 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' কিতাবে উল্লেখিত উক্তিসমূহ ১৮

ফাসিক ও কাফের-মুরতাদ শাসক ২০

একটি দৃষ্টান্তমূলক বাঁক ২২

আমাদের মূল আলোচনা কি নিয়ে? ২৬

শাইখ আবু বকর নাজীর একটি সুন্দর মূল্যায়ন ২৮

থানভী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ৩২

রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বাধাগুলো ৩৪

এ বর্ণনাগুলোর দাবি ৪১

ফলাফল: ৪৩

থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর তিনটি কথা: সামর্থ্য, সুস্পষ্ট কুফর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ৪৭

একটি ছোট্ট ভূমিকা ৪৯

এক. সামর্থ্যের জনবল ৫৩

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল ৫৮

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল ৬২

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল ৬৮

সামর্থ্যের চার দিক ও আমাদের বর্তমান অবস্থা.....৭০

রাষ্ট্রপক্ষ ও মুসলমান.....৮০

পাঁচ. সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কি?.....৮৫

সামর্থ্যের বাস্তবতাঃ কয়েকটি উদাহরণ.....৮৯

শরীয়তের কিছু মৌলিক নীতিমালা:.....৯৫

আমাদের করণীয়:.....১০১

থানভী রহিমাহুল্লাহর দ্বিতীয় কথা: সুস্পষ্ট কুফর.....১০৩

থানভী রহিমাহুল্লাহর তৃতীয় কথা: সুস্পষ্ট প্রকাশ.....১০৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দ্বীন ও শরীয়তের অনেক স্বীকৃত-স্পষ্ট, সর্বসম্মত ও অকাট্য বিষয়কে অস্পষ্ট ও বিতর্কিত করার প্রবণতা এখন প্রতিদিনের বাস্তবতা। কুরআনের মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট বিষয়গুলোর পেছনে পড়ে সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে বলেছেন। সে প্রবণতার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়, সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকে অস্পষ্ট করে তোলার মানসিকতা, যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকার।

দ্বীন ও শরীয়তের যেসব অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয় এ মানসিকতার শিকার তার মধ্যে একটি হচ্ছে, কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহের বিষয়টি। অর্থাৎ একটি দারুল ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার যে ফরয দায়িত্ব আছে এবং যে বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের কোনো দ্বিমত নেই, সে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে তোলার প্রবণতা এখন ব্যাপক। এ কাজটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

এক. কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরকে একটি অস্তিত্বহীন কুফর হিসাবে সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ যেকোনো ব্যক্তি যে কোনো কুফরই করুক না কেন, তা বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ করে সে কুফরকে এমন একটি অস্পষ্ট বিষয় হিসেবে প্রমাণিত করা, যার দ্বারা ব্যক্তি যত সুস্পষ্ট কুফরেই লিপ্ত হোক না কেন, সে কখনও কাফের হওয়া সম্ভব হবে না।

দুই. কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর যার থেকে প্রকাশ পায় তার অন্যান্য কিছু মুসলমান সুলভ আচরণের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট কুফরকে

অস্পষ্ট করে তোলা এবং তার মাঝে স্পষ্ট কুফর পাওয়া সত্ত্বেও তাকে মুসলমান এবং মুসলমানদের কর্ণধার হিসাবে মান্য করা।
তিন. কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরকে কুফর হিসাবে মেনে নেয়ার পরও বিভিন্ন অজুহাতে তা স্বীকার না করা, তা প্রকাশ না করা এবং তার উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ফরয দায়িত্বগুলোকে এড়িয়ে চলা।

থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর একটি উক্তি

প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার শুরুতে একটি কথা বলে রাখা ভাল হবে। মুরতাদ ও কাফের রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের মাসআলা প্রসঙ্গে শাইখ আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর একটি উক্তির ইদানীং খুব চর্চা হচ্ছে। তা হচ্ছে, থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত প্রযোজ্য। ১. অপসারণের সামর্থ্য থাকা। ২. অপসারণ করতে গিয়ে আরও বড় ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকা।
এ উক্তির উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা আমাদের মাঝে খুব চর্চিত হচ্ছে। প্রথম আলোচনার ফলাফল হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান কুফরে বাওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়ে মুরতাদ ও কাফের হয়ে যাওয়ার পরও মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকা ও সবর করা।
অপর আলোচনার ফলাফল হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান কুফরে বাওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে বিদ্রোহ করা, বিদ্রোহের জন্য অস্ত্রধারণ করা, অস্ত্রধারণের জন্য সামর্থ্য অর্জন করা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সব শেষে বারাআত

ও হিজরত করা ফরয। সবর করা, নির্লিপ্ত থাকা, কাফের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গ দেয়া, তার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা বা এমন অবস্থান গ্রহণ করা যার দ্বারা কাফের রাষ্ট্রপ্রধান উপকৃত হয়, কৌশলের অজুহাতে তার উচ্ছিষ্ট ভোগ করা ইত্যাদি সবই হারাম।

আলোচনার দুটি দিককেই আমরা একটু বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব (হাফিযাল্লাহ) থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর আলোচিত বক্তব্যটি তাঁর 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' কিতাবে উল্লেখ করেন।

মুফতী সাহেব বলেন, থানভী রহিমাহুল্লাহ 'জাজলুল কালাম ফী আজলিল ইমাম' কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কিতাবটি ইমদাদুল ফাতাওয়ার মাঝে সংযুক্ত হয়ে ছাপা হয়। মুফতী সাহেব যে, এ কিতাবটির সারসংক্ষেপ তাঁর 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' কিতাবে সংযুক্ত করা হয়।

এ মুহূর্তে আমার সামনে মুফতী সাহেবের 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' এবং 'ইমদাদুল ফাতাওয়া'য় সংযুক্ত 'জাজলুল কালাম ফী আজলিল ইমাম' কিতাবটি আছে। 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' এ উল্লিখিত সারসংক্ষেপটি নেই। আমি থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর কিতাব ও মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের যে কিতাবটি আছে সে দুটির আলোকেই সামনের আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, মুফতী তাকী উসমানী সাহেব থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর উক্তিসহ যে কথাগুলো উল্লেখ করেন তার কোন্ কোনটিতে ইমদাদুল ফাতাওয়ার উক্তি আছে, আর কোন্ কোনটিতে নেই। আবার 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত'এ উল্লিখিত কিছু কথা আমি থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর আলোচ্য কিতাবে পাইনি।

এক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবে কথাটি আছে কিন্তু আমার দুর্বলতার কারণে আমি পাইনি। আবার এমনও হতে পারে যে, মুফতী সাহেব থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি উল্লেখ করার কোনো এক পর্যায়ে নিজেও আলোচনা করেন। কিন্তু আমি দুটিকে পার্থক্য করতে পারিনি। এ কারণে যতটুকু কথা থানভী রহিমাহুল্লাহ- এর কথা হিসাবে আমি নিশ্চিত হতে পারব ততটুকু তাঁর উক্তি রূপে বলব, আর যতটুকুর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব না ততটুকু আপাতত মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের কথা হিসাবেই উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে একজনের কথা আরেক জনের কথা হিসাবে চলে আসার সামান্য আশঙ্কা আছে। সে জন্য আমি অপারগ এবং ক্ষমা প্রার্থী ।

দুটি বক্তব্য ও তার মূল্যায়ন

মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত'-এর দুটি বক্তব্য শুরুতে দেখে নেয়া যাক। প্রথমটি হচ্ছে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত উবাদা ইবনে সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গে। হাদীসটি হচ্ছে-

على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وان لاننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. صحيح البخاري، كتاب الفتن

অনুবাদ: "আমরা আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, কঠিন-স্বাভাবিক, আমাদের বিপক্ষে স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতা সর্বাবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর বাইয়াত দেই। এবং এ কথার ওপরও বাইয়াত দেই যে, আমরা শাসকদের মাঝে সুস্পষ্ট কুফর দেখার আগ পর্যন্ত -যে কুফরের ব্যাপারে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল

থাকবে- তাদের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করব না।" -সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান

হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলা হয়-

اس کا حاصل یہ ہے کہ امیر کے خلاف ھتھیار اٹھا کر اس کا تختہ الٹنے کی کوشش صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب اس سے کھلا کفر سرزد ھو جائے۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص:۳۶۸

অনুবাদ: "এর সারকথা হচ্ছে, আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা শুধু তখন করা যাবে যখন তার থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৮

আর কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর -এর উদাহরণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়-

لیکن اگر امیر نے اس کو ایک مستقل پالیسی بنا لیا کہ وہ مستقل طور سے لوگوں کو معصیتوں پر مجبور کرنے لگا ہے، اور اس میں غیر اسلامی قوانین کو شریعت کے مقابلہ میں زیادہ بھتر سمجھتا ہے تو یہ کفر صریح ہے۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص:۳۶۷

অনুবাদ: "কিন্তু আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোনো নীতি গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সে মানুষদেরকে নিয়মিত গুনাহ করার উপর বাধ্য করতে থাকে, আর সে ক্ষেত্রে সে অনৈসলামিক আইনকে শরীয়তের বিপরীতে বেশি উপযোগী মনে করে, তাহলে তার এ আচরণ সুস্পষ্ট কুফর।" -ইসলাম আওর সিয়াসি নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৭

যার ফলাফল দাঁড়ায় যথাক্রমে-

এক. আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান থেকে সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হবে, অস্ত্রধারণের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হবে।

দুই. আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোনো নীতি গ্রহণ করে যার মাধ্যমে মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করা হয় এবং মানব রচিত অনৈসলামিক আইনকে ইসলামী আইনের চাইতে বেশি উপযোগী মনে করে তাহলে তার এ আচরণ কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর।

অতএব যারা বর্তমান যামানায় মানব জীবনের প্রতিটি পর্ব থেকে ইসলামী আইনকে বিলুপ্ত করে, শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবন পরিচালনা করাকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করে, মানব রচিত আইনে সবকিছু পরিচালনা করছে এবং সবাইকে সে আইন অনুযায়ী চলতে বাধ্য করছে, তারা মুরতাদ-কাফের। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মুসলমানদের দায়িত্ব।

থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকেও আমরা বিষয়টি দেখলাম। এ নিবন্ধে দলীলের আলোকে মাসআলাটি আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর উক্তি দিয়ে যে কথাগুলোর চর্চা হচ্ছে, সে কথাগুলোর পর্যালোচনা উদ্দেশ্য। তাই হাকীম বা শাসক মুরতাদ হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্রসঙ্গটি এখানে তাঁর উক্তি দিয়েই উত্থাপন করা হচ্ছে।

থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর আলোচিত শর্ত দুটি

থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর উক্তিতে প্রচারিত শর্ত দুটির উল্লেখ আমরা মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের কিতাবে এভাবে পেয়েছি-

نیز دو شرطیں اور ظاہر ھیں، اور یہ کہ اس کو طاقت کے ذریعے ھٹادینے کی قدرت ھو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ھٹانے میں اور کوئی اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ھو۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص:۳۶۵

অনুবাদ: "এমনিভাবে আরও দুটি শর্ত আরও সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে,প্রথম শর্ত, শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মতো শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে অপসারণ করতে গিয়ে তার চাইতে বড় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ:৩৬৫

دوسری بات یہ ھے کہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، اس بات پر تمام حضرات فقھا متفق ھیں کہ خروج جھاں کھیں بھی جائز ھوتا ھے، اس کے لئے دو شرطیں ضروری ھیں. ایک یہ کہ طاقت کے ذریعہ حکومت کو ھٹا دینے کی قدرت ھو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ھٹانے میں اور کوئی اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ھو۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص:۳۶۸

অনুবাদ: "দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেমনিভাবে আগেও বলা হয়, এ বিষয়ে সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, বিদ্রোহ যেখানেই বৈধ হয় তার জন্য দুটি শর্ত জরুরি। প্রথম শর্ত হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতাচ্যুত করার মতো সামর্থ্য থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে অপসারণ করলে তার চাইতে বড় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৮

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব শর্ত দুটি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সরাসরি থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর রেফারেন্স দেননি। তবে থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর এ বিষয়ক আলোচনা বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে

এ শর্ত দুটিও উল্লেখ করেন। মুফতী সাহেব শর্ত দুটি উল্লেখ করে যে ফলাফল বিশ্লেষণ করেন তা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের বিশ্লেষণ:

উপরে উল্লিখিত দুটি শর্তের ভিত্তিতে মুফতী তাকী উসমানী সাহেব বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান কাফের মুরতাদ হয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিজয় নিশ্চিত না হলে অস্ত্রধারণ করবে না। তাঁর বক্তব্য দেখুন-

نیز دو شرطیں اور ظاہر ھیں، اور یہ کہ اس کو طاقت کے ذریعے ھٹادینے کي قدرت ھو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ھٹانے میں اور کوئي اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ھو. مثلا یہ غالب گمان ھو کہ اس کو ھٹانے کے بعد بھي طالبان اقتدار کے درمیان جنگ جاري رھیگي، اور کسي ایک شخص پر لوگ متفق نھیں ھو سکیں گے، اور تمام تر جد جھد کے بعد بھي عوام کو مسلسل خونریزي کے سوا کچھ ھاتھ نھیں آئے گا، یا اس خانہ جنگي سے فائدہ اٹھاتے ھوے کوئي دشمن ملک پر چڑھائي کرکے ملک پر قبضہ کرلے گا، اور ابھي تک تو صرف امیر ھي کافر تھا، اب پورا ملک (معاذ اللہ) دار الاسلام کي حیثیت کھو بیٹھے گا، اور دشمن ملک کے تسلط سے دار الکفر میں تبدیل ھو جائے گا۔ اسلام اور سیاسي نظریات ص:۳۶۵

অনুবাদ: "এমনি আরও দুটি শর্ত আরও সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মতো শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে অপসারণ করতে গিয়ে তার চেয়ে বড় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, এমন প্রবল ধারণা হল যে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর যারা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তাদের পরস্পরে যুদ্ধ

চলতে থাকবে এবং কোনো একজনের ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারবে না। সকল চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও সাধারণ মানুষ রক্তপাত ছাড়া আর কিছু পাবে না, অথবা সেই আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে কোনো শত্রু দেশের উপর হামলা করে তা দখল করে বসবে। আর এতদিন তো শুধু রাষ্ট্রপ্রধান কাফের ছিল, এখন পুরো দেশ (আল্লাহ না করুন) দারুল ইসলামের মর্যাদা হারিয়ে বসবে এবং দেশের উপর শত্রুর আধিপত্যের কারণে তা দারুল কুফরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ:৩৬৫

আলোচিত দুটি শর্তের উপকারিতা বিশ্লেষণ কালে তিনি যে কথাগুলো বলেন তা হচ্ছে যথাক্রমে:

ক. কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মুসলমানদের পরস্পরে কোন্দল ও আত্মকলহের আশঙ্কা থাকলে কাফের মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

খ. কাফের মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর যদি সাধারণ মুসলমানদের মাঝে রক্তপাতের অশঙ্কা থাকে তাহলে কাফের মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না।

গ. কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বাহিরের কোনো কুফরী শক্তি দেশ দখল করে ফেলার আশঙ্কা থাকলে দেশের কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না।

ঘ. দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হলে দেশ দারুল ইসলামই থাকবে, দারুল হারব হবে না। তবে বিদেশি কাফের-মুরতাদরা দেশ দখল করে ফেললে দেশ দারুল হারব হয়ে যাবে। সে দেশ আর দারুল ইসলাম থাকবে না।

উল্লেখ্য, মুফতী সাহেব অন্য জায়গায় বলেন, দেশের আইন অনৈসলামিক হলে দেশ দারুল হারব হবে না, যদি রাষ্ট্রপ্রধান

মুসলমান হয়। যার অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান না হলে দেশ দারুল হারব হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি এখানে বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হয়ে গেলেও দেশ দারুল ইসলামই থাকবে। তবে বিদেশি কাফের-মুরতাদরা দেশ দখল করলে সেটি দারুল হারব হয়ে যাবে।

দারুল হারব ও দারুল ইসলাম বিষয়ক তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ-

در حقیقت کسي ملک کے دار الاسلام قرار پانے کے لئے اصل بات یہ ھے کہ اس پر مکمل اقتدار مسلمانوں کو حاصل ھو، اور انھیں اپنے احکام جاري کرنے کي مکمل قدرت حاصل ھو..... اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسي رحمۃ اللہ علیہ نے دار الاسلام کي تعریف میں صرف یہ بات ذکر فرمائي ھے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ھو، اور اسي بات کو جامع الرموز کي عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ھے کہ اس میں مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ھو، یعني اس کے احکام نافذ ھوتے ھوں، قطع نظر اس کے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ھیں یا نھیں۔ اسلام اور سیاسي نظریات ص:۳۲۵

অনুবাদ: "মূলত কোনো একটি দেশ দারুল ইসলাম হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আসল বিষয় হচ্ছে, সে দেশের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা মুসলমানদের হবে এবং তারা তাদের বিধানাবলী প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতাবান হবে। ... উপরে আপনারা দেখেছেন, আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহ দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এ কথাটি উল্লেখ করেন যে, তা মুসলমানদের কব্জায় থাকবে। আর তাঁর সে কথাটিকেই জামিউর রুমূয কিতাবের বক্তব্যে এভাবে প্রকাশ করা হয় যে, সে দেশে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে। অর্থাৎ তার বিধানাবলী প্রয়োগ হয়। চাই তার বিধানাবলী শরীয়তের

বিধানাবলীর মোতাবেক হোক বা না হোক।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩২৫

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব বিষয়ক তাহকীক এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়ে কখনও লেখার সুযোগ হলে আমরা ইনশাআল্লাহ দেখাব যে, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ভরশীল হচ্ছে সে দেশের ইসলামী বা কুফরী আইনের উপর। সুতরাং সারাখসী ও জামিউর রুমুযের বক্তব্য থেকে তিনি যে ফলাফল উদ্ধার করেন তা বাস্তবসম্মত নয়। এখানে শুধু আমরা দেখাতে চাই যে, তিনি তাঁর 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' কিতাবের ৩২৫ পৃষ্ঠায় বলেন, দেশ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের কব্জায় থাকলেই তা দারুল ইসলাম, দেশে চাই কুফরী আইন চলুক আর চাই ইসলামী আইন চলুক। কিন্তু তিনি একই কিতাবের ৩৬৫-৩৬৬ পৃষ্ঠায় বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হওয়ার পরও তা দারুল ইসলাম থাকবে। তাই কাফের-মুরতাদ কর্তৃক শাসিত এই দারুল ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা উচিত হবে। কারণ এতে বিদেশি কাফের-মুরতাদ দেশ দখল করে নেবে এবং দেশ দারুল হারব হয়ে যাবে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও পরিষ্কার করা উত্তম হবে যে, 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' কিতাব থেকে যে অংশটুকু এখানে উল্লেখ করেছি, তাতে কোনো কিছু বাদ দেয়া হয়নি যার কারণে উল্লেখকৃত অংশের উদ্দেশ্য বদলে যেতে পারে।

এ বিশ্লেষণে উল্লিখিত উক্তিগুলো ও বিশ্লেষণের ফলাফল:

রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে দুটি শর্ত লাগবে -এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর এবং বিদ্রোহ করার সমস্যা ও বিদ্রোহ না করার বিভিন্ন সুবিধা

আলোচনা করার পর, তাঁর এ মতের সমর্থনে তিনি যে উক্তি উল্লেখ করেন তা আমরা এখানে উল্লেখ করব এবং দেখব এগুলো কাফের-মুরতাদ শাসকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব কি না। বা যাঁদের উক্তি পেশ করা হয়, তাঁরা কথাগুলো কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য বলেছেন কি না?

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা বিষয়ে 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' কিতাবে উল্লেখিত উক্তিসমূহ

এক. ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য:

إن قام به رجل واحد قتل ولم يصلح للناس أمر، ولكن إن وجد عليه أعوانا صالحين ورجالا يرأس عليهم مأمونا في دين الله. وهذه فريضة ليست كالفرائض يقوم بها الرجل وحده، وهذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل، فأخاف أن يعين على قتل نفسه. (من الجواهر المضيئة للقرشي) اسلام اور سياسي نظريات ص: ٣٦٨

অনুবাদ: "দায়িত্বটি যদি একা একজন আদায় করে তাহলে সে মারা যাবে, কিন্তু মানুষদের জন্য কিছুই করতে পারবে না। তবে যদি দায়িত্বটি পালনের জন্য কিছু সৎ সহযোগী ব্যক্তি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে স্বচ্ছ থেকে তাদের উপর নেতৃত্ব দেবে। এটি এমন একটি দায়িত্ব যা অন্যান্য দায়িত্বের মতো নয়, যা কোনো ব্যক্তি একাই আদায় করে নিতে পারে। যখন মানুষকে একাই এ কাজ নিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হবে, তখন সে রক্তে রঞ্জিত হবে এবং নিজেকে খুনের জন্য পেশ করবে। কাজেই আমার ভয় হয় যে, সে নিজেকে হত্যার জন্য সাহায্য করবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৮

দুই. হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহর বিবরণ:

الحسن بن صالح كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. هذا مذهب للسلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر .... والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد.(تهذيب التهذيب، ترجمة الحسن بن صالح) اسلام اور سياسي نظريات ص: ٣٦٩

অনুবাদ: "হাসান ইবনে সালেহ অস্ত্রধারণের মত্ পোষণ করতেন। অর্থাৎ জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহকে তিনি সমর্থন করতেন। এটি প্রথম যুগের সালাফের অভিমত। কিন্তু পরবর্তীতে এটা না করার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ তাঁরা দেখেন, বিষয়টি আরও জটিলতার দিকে ধাবিত হয়। যেমন হাররার ঘটনা ও ইবনুল আশআসের ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে যারা ভাববে তাদের জন্য সেসব ঘটনা থেকে নসীহত গ্রহণ করার মতো অনেক কিছু আছে। এরপরও হাসান কারও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৯

তিন. ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য:

قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. اسلام اور سياسي نظريات ص: ٣٦٩

অনুবাদ: "ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, শাসক যদি জুলুমও করে তবু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার পক্ষে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হন যে, বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য করা এবং তার অধীনে জিহাদ করা ওয়াজিব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য উত্তম। কারণ বিদ্রোহ করার মাঝে রক্তপাত ও ব্যাপক

হত্যাকাণ্ডের আশঙ্কা আছে। তাদের পক্ষে দলীল হচ্ছে এ হাদীস এবং এর সমর্থক অন্যান্য হাদীস। একটি সুরত ব্যতীত আর কোনো সুরতকে তাঁরা এ হুকুম থেকে বাদ দেননি। আর তা হচ্ছে, যখন রাষ্ট্রপ্রধান থেকে সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যাবে। তখন এক্ষেত্রে তার আনুগত্য জায়িয নেই; বরং যাদের দ্বারা সম্ভব তাদের উপর তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৯

চার. সারাখসী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য:

وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور، وليس هذا بمذهب لنا، وقد بينا ذلك فيما أمليناه من شرح الزيادات في باب التحكيم. شرح السير الكبير، باب الاستئجار في أرض الحرب والنفل اسلام اور سياسي نظريات ص: ٣٧٠

অনুবাদ: "যাঁরা মনে করেন জুলুম-অত্যাচার করলে শাসক ক্ষমতচ্যুত হয়ে যাবে তাঁরা এ শব্দ দিয়ে দলীল দেন। তবে এটা আমাদের মাযহাব নয়। শরহুজ জিয়াদাতের বাবুত তাহকীমে আমি যা লিখেছি সেখানে আমি বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছি।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৭০

কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার পক্ষে মুফতী তাকী উসমানী সাহেব এ চারটি উক্তি উল্লেখ করেন। যে চারটি উক্তির প্রত্যেকটিতে আমরা দেখছি এগুলোর একটিও কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসঙ্গে নয়। প্রত্যেকটিই জালিম ও ফাসিক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রসঙ্গে। বরং ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ সুস্পষ্ট করে বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে কুফর প্রকাশ পেলে তার বিধান ভিন্ন।

ফাসিক ও কাফের-মুরতাদ শাসক

বিগত অনেক বছর যাবত, বা বলা যায় অনেক যুগ যাবত এ দুটি বিষয়কে আলাদা করতে দায়িত্বশীলগণের ঘাম ঝরে যাচ্ছে। কাফের-মুরতাদ শাসকের বিধান আলোচনা করতে গেলেই তাকে জালিম ও ফাসিক শাসক বিষয়ক দলীল প্রমাণ দিয়ে ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে।

এ পক্ষটি হয়ত বোঝেন না, নয়ত বোঝার চেষ্টা করেন না, অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করে জালিম ও ফাসিক শাসক বিষয়ক হাজার হাজার ঘটনা ও সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলোকে এনে কাফের-মুরতাদ শাসকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। অথচ দুটির মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

এ বিষয়টি কুরআনে কারীমে, বিভিন্ন হাদীসে এবং ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্তে, সব জায়গায়তেই সুস্পষ্ট। জালিম-ফাসিক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান আলাদা এবং কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান আলাদা। কিন্তু একটি পক্ষ এ সুস্পষ্ট বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে তোলার জন্য দুটি পর্বে মেহনত করে যাচ্ছে।

প্রথম পর্ব হচ্ছে এ কথা প্রমাণ করা যে, মুসলমান নামধারী কোনো শাসক থেকে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে, জালিম ও ফাসিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধানের সকল দলীল এনে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধানের দলীল হিসেবে স্তুপ করা। যেমনটি আমরা এ লেখার শুরুতেও ইঙ্গিত করেছি।

কোনো কাফের-মুরতাদ শাসকের শাসন থেকে বেরিয়ে মুসলিম শাসকের অধীনে জীবন কাটানোর জন্য এবং গাইরুল্লাহর আইনের শাসন থেকে বের হয়ে আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে নিজেকে

ন্যস্ত করার জন্য মুসলমানদেরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবধারিত বিধান দেয়া হয়। আর তা হল, বিদ্রোহ করা ও অস্ত্রধারণের মাধ্যমে জিহাদ করা। কিন্তু সকল তাহকীক ও গবেষণার ফলাফল যাচ্ছে এ সিদ্ধান্তের দিকে যে, শাসক কাফের মুরতাদ হয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অস্ত্রধারণ করা যাবে না, আর গাইরুল্লাহর আইনের অধীনে চলতে বাধ্য হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অস্ত্রধারণ করা যাবে না। যদিও শাসকের হাত-পায়ের সংখ্যা ষোলশত এবং মুসলমানের সংখ্যা ষোল কোটি! কাফের-মুরতাদের হাত-পায়ের সংখ্যা বিশশত এবং মুসলমানের সংখ্যা বিশ কোটি হয়! কাফের-মুরতাদ ও গাইরুল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের এমন স্বীকৃত ও অকাট্য একটি বিধান কীভাবে অপর সাধারণ একটি মাসআলার ভিতরে হারিয়ে যেতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না।

একটি দৃষ্টান্তমূলক বাঁক

নিম্নোক্ত বক্তব্যটি আমরা একটু ধ্যানের সঙ্গে লক্ষ করব। নিচে যে বক্তব্যটি দেয়া হয়, এখানে দুটি সুরতের হুকুম বলা হয়। প্রথম সুরত হচ্ছে, কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরের, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যা সুস্পষ্ট কুফর নয়। দুটির হুকুম একই ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করা হচ্ছে। দুটি সুরতের হুকুম বর্ণনা কালেতে দ্বিতীয় সুরতের দলীল প্রমাণ দিয়ে আলোচনাটিকে শক্তিশালী করা হয়, আর আলোচনার শুরুতে দুটি সুরতকেই এ বিধানের আওতাভুক্ত করে ফেলা হয়। প্রথম সুরতের যে আলাদা সুস্পষ্ট বিধান আছে তা বেমালুম ভুলে যাওয়া অথবা ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। আমাদের উপর দোষারোপ না করে একটু দেখুন-

ایک یہ کہ خاص طور پر آخری صورت میں آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا امیر کے مسلسل خلاف شریعت عمل کو کفر بواح کے ساتھ ملحق کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ کہے کہ اس کے خلاف خروج کرنا چاہئے، اور بعض کہیں کہ خروج نہیں کرنا چاہئے. ایسا اختلاف آراء اجتھادي اختلاف ہوگا، اور اس میں کوئي جانب قابل ملامت نہیں ہوگي. چنانچہ صدر اول میں یزید اور بنو امیۃ کے حکمرانوں کے خلاف حضرت حسین رضي اللہ تعالی عنہ نے یا اھل حرہ نے جو خروج فرمایا، اس میں اسي قسم کا اجتھادي اختلاف تھا. نیز حضرت امام ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن علی اور ابراھیم نفس زکیۃ رحمھما اللہ تعالی کے خروج کي جو حمایت کي، اور اس کے بارے میں بھي دوسرے حضرات نے جو اختلاف فرمایا، اس کي وجہ بھي یھي تھي.

دوسري بات یہ ہے کہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، اس بات پر تمام حضرات فقھا متفق ہیں کہ خروج جھاں کہیں بھي جائز ہوتا ہے، اس کے لئے دو شرطیں ضروري ہیں. ایک یہ کہ طاقت کے ذریعہ حکومت کو ہٹا دینے کي قدرت ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ہٹانے میں اور کوئي اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو. اس بارے میں بھي اختلاف رائے کا امکان ہے. اسلام اور سیاسي نظریات ص:۳۶۷-۲۶۸

অনুবাদ: “প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, বিশেষত শেষ সুরতে এভাবে মতামতের পার্থক্য হতে পারে যে, আমীরের ধারাবাহিক শরীয়ত বিরোধী আচরণকে কুফরে বাওয়াহ-সুস্পষ্ট কুফরের সঙ্গে যুক্ত করা যায় কি যায় না? এক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে যে, কেউ কেউ বলবেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চাই। আর কেউ কেউ বলবেন, বিদ্রোহ না করা চাই। মতামতের এ পার্থক্যগুলো ইজতিহাদ ভিত্তিক ইখতিলাফ হিসাবে ধর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে কোনো পক্ষকেই দোষ

দেয়া যাবে না। যেমন প্রথম যুগে দেখা যায়, ইয়াযীদ ও বনু উমাইয়ার শাসকদের বিরুদ্ধে হুসাইন রাযিয়াল্লাহ অথবা হাররাবাসী যে বিদ্রোহ করেছে, সে বিদ্রোহ নিয়ে এ ধরনের ইজতিহাদী মতপার্থক্য ছিল। এমনকি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহ যায়দ ইবনে আলী ও ইবরাহীম নাফসে যাকিয়্যা রাহিমাহুমাল্লাহুর বিদ্রোহের পক্ষে যে সহযোগিতা করেন এবং এ বিষয়ে অন্য যারা দ্বিমত করেন, তার কারণও এটাই ছিল।"

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেভাবে আগেও বলা হল যে, এ বিষয়ে সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, বিদ্রোহ যেখানেই বৈধ হবে তার জন্য দুটি শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি। একটি হচ্ছে, শক্তি ব্যবহার করে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার সামর্থ্য থাকা। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার দ্বারা আরও বড় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকা। এ বিষয়েও দ্বিমত থাকার সম্ভাবনা আছে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৭-৩৬৮

উল্লেখ্য, মুফতী তাকী উসমানী সাহেব থানভী রহিমাহুল্লাহর উক্তি দিয়ে দুই প্যারা আগে নিচের কথাগুলো উল্লেখ করেন। যেখানে আলাদা দুটি সুরত খুব পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়। কিন্তু দুটি সুরতেরই একই সমাধান দেয়া হয়, যা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। থানভী রহিমাহুল্লাহর বাতলানো সুরত দুটি দেখুন-

اس کے علاوہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ھیں کہ ایک اور صورت ایسی ھے جس میں امیر کا فسق دوسروں تک متعدي ھو رھا ھو، یعني امیر لوگوں کا دین خراب کر رھا ھو، مثلا لوگوں کو معصیت پر مجبور کر رھا ھو، تو اگر یہ عمل کسي ایک یا دو فرد کے ساتھ ھو تو اس کا حکم اکراہ ھوگا، اور اکراہ کے احکام جاري ھوں گے، لیکن اگر امیر نے اس کو ایک مستقل پالیسي بنا لیا کہ وہ مستقل طور

سے لوگوں کو معصیتوں پر مجبور کرنے لگا ھے، اور اس میں غیر اسلامي قوانین کو شریعت کے مقابلہ میں زیادہ بھتر سمجھتا ھے تو یہ کفر صریح ھے، اور اگر فوقیت نھیں دیتا لیکن تاویلا (شریعت کي غلط تشریح کر کے) یا تکاسلا (سستي کي بنا پر) اس کو چھوڑا ھوا ھے تو بھي اگرچہ یہ کفر صریح نہ ھو، لیکن کفر کے حکم سے ملحق ھو سکتا ھے، کیوں کہ اس سے شریعت کا استخفاف لازم آتا ھے، لھذا اس صورت میں بھي خروج جائز ھے، لیکن یھاں دو اھم باتیں یاد رکھني ضروري ھیں. اسلام اور سیاسي نظریات ص:۳۶۷

অনুবাদ: “এছাড়া থানভী রাহমাতুল্লাহ বলেন, আরেকটি সুরত এমন আছে যে সুরতে আমীরের ফিসক অপরাধ অন্যদের পর্যন্ত গড়ায়। অর্থাৎ আমীর মানুষের দ্বীন নষ্ট করছে। যেমন মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করছে। এক্ষেত্রে এ কাজটি যদি এক দুই ব্যক্তির সঙ্গে হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ইকরাহ-বাধ্য করার বিধান হবে। তার জন্য বাধ্য করার বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোনো নীতি গ্রহণ করে,যার মাধ্যমে সে মানুষদেরকে নিয়মিত গুনাহ করার উপর বাধ্য করতে থাকে, আর সে ক্ষেত্রে সে অনৈসলামিক আইনকে শরীয়তের বিপরীতে বেশি উপযোগী মনে করে, তাহলে তার এ আচরণ সুস্পষ্ট কুফর। আর যদি প্রাধান্য না দেয়, কিন্তু অপব্যাখ্যা করে বা অলসতা করে তা ছেড়ে দেয়, সে ক্ষেত্রেও যদিও এটা সুস্পষ্ট কুফর নয়, কিন্তু কুফরের বিধানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কেননা এর দ্বারা শরীয়তের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। অতএব এ সুরতেও বিদ্রোহ জায়িয আছে। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি জরুরি কথা মনে রাখা চাই।” - ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত পৃ: ৩৬৭

থানভী রহিমাহুল্লাহ তাঁর আলোচনায় দুটি সুরত খুবই সুস্পষ্ট করে আলাদা করেন। একটি সুরত কুফরে বাওয়াহ-সুস্পষ্ট কুফরের, আরেকটি সুরত অস্পষ্ট কুফরের। মুফতী তাকী উসমানী সাহেব কুফরে বাওয়াহ-সুস্পষ্ট কুফরের সুরতটিকে অস্পষ্ট কুফরের যে সুরত বলা হয় সে সুরতের মাঝে বিলীন করে দিয়ে, সুস্পষ্ট কুফরকে অস্পষ্ট কুফরের অনুগত বানিয়ে অস্পষ্ট কুফরের বিস্তারিত আলোচনাকে সামনে এগিয়ে নেন। এখন আমরা হয়ত বলব, তিনি সুস্পষ্ট কুফর ও অস্পষ্ট কুফর উভয়ের বিধানকে বরাবর মনে করেন। অথবা বলব, তিনি সুস্পষ্ট কুফরের বিষয়টি বিশেষ কোনো কারণে এড়িয়ে যান। তবে আমরা যাই বলি, তার কোনোটিই আপত্তি থেকে মুক্ত নয়।

আমাদের মূল আলোচনা কি নিয়ে?

বিগত কয়েক যুগ ধরে আমাদের এ বিষয়ক আলোচনাগুলো কি নিয়ে? শাসকের সগীরা-কবীরা গুনাহ নিয়ে? না কি শাসকের কুফর নিয়ে? থানভী রহিমাহুল্লাহ শাসকদের যে আচরণটিকে সুস্পষ্ট কুফর বলে সাব্যস্ত করেন, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত গণতান্ত্রিক আইনকে যারা প্রাধান্য দিয়ে প্রতিনিয়ত কুফরীতে রত, যে গণতন্ত্র বিগত প্রায় শত বছর ধরে বিশ্বের মুসলমানদের উপর মানব রচিত গাইরুল্লাহর আইন চাপিয়ে তাদেরকে প্রতিনিয়ত গুনাহ করতে বাধ্য করছে তাদের কুফর, তাদের ইরতিদাদ, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং সে সকল মুরতাদ-কাফের-তাগুতদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের করণীয় কি তা নিয়েই

আলোচনা । মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব কি তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

কিন্তু আমাদের মাশায়েখ ও জিম্মাদারগণ সুস্পষ্ট কুফর ও সুস্পষ্ট কাফের মুরতাদ শাসকের আলোচনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফাসিক ও গুনাহগার জালিম শাসকের দরবারে নিয়ে হাজির করেন। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কাফের-মুরতাদ শাসকের বিধান। কিন্তু তাঁরা ফাসিক ও জালিম শাসকের বিধান বর্ণনা করেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয়ে নিরত। আলোচনা চলছে কাফের-মুরতাদ শাসকদেরকে নিয়ে। কিন্তু তাঁরা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিদ্রোহের কাহিনী লিখে লিখে নিজেরাও ক্লান্ত হন, পাঠককেও ক্লান্ত করেন। আলোচনা চলছে শরীয়তের বিধান বিলুপ্তকারী গণতান্ত্রিক মানব রচিত গাইরুল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে নিয়ে। কিন্তু তারা খিলাফতে বনু উমাইয়ার খলীফাদের বিরুদ্ধে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ, হাসান ইবন সালিহ রহিমাহুল্লাহ-এর ফাতওয়া, তাঁদের অবস্থানের বিশদ বিশ্লেষণে নিরত ।

কুরআন-হাদীসের বিধানের উপর ঘোষণা দিয়ে, তালা দিয়ে যারা মানব রচিত গণতান্ত্রিক গাইরুল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শপথ করে, তা বাস্তবায়নে নিরত, তাদেরকে যারা বনু উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে, তাঁদের কাছে কি সুস্পষ্ট কুফর ও কবীরা গুনাহের মাঝে কোনো সীমারেখা নেই? থানভী রহিমাহুল্লাহ যে সুস্পষ্ট কুফরের উদাহরণ তুলে ধরে তাকে অস্পষ্ট কুফর থেকে আলাদা করেছেন, এখান থেকেও কি আমরা ফাসিক-জালিম শাসক ও কাফের-মুরতাদ শাসকের পার্থক্য বুঝতে পারি না?

যদি আমরা পার্থক্য বুঝে থাকি তাহলে দুটিকে বার বার একই পাত্রে কেন গুলিয়ে ফেলছি? একটির কথা বলতে গিয়ে আরেকটি দলীল কেন টেনে আনছি? একটির দলীল দিতে গিয়ে আরেকটির উদাহরণ কেন টেনে আনছি?

শাইখ আবু বকর নাজীর একটি সুন্দর মূল্যায়ন

শাইখ আবু বকর নাজী বলেন-

"…. বাস্তবতার সঙ্গে এ পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের বিকৃতি আজ ঘটছে তা দেখানোর জন্য আমরা একটি নির্দিষ্ট আলোচনার দিকে তাকাব।

বিষয়টি হল, মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে মাসলাহা-মাফসাদা (কল্যাণ-অকল্যাণ)।

পরিভাষার বিকৃতি কত ক্ষতিকারক হতে পারে তা বোঝার জন্য এটি একটি ভাল প্র্যাকটিকাল উদাহরণ। তাছাড়া দুই শতাব্দী যাবত যেসব কাফের আসলি মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর উপর হামলা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আলোচনার সঙ্গে এটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাসলাহা-মাফসাদাহ পরিভাষাটি ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করার কারণে এবং এ ব্যাপারে বিকৃত বুঝের ফলে মুরতাদ শাসকের সঙ্গে ঠিকভাবে বোঝাপড়া করা সম্ভব হয়নি।

বিকৃতকারীরা প্রথমে শুরু করে একটি ঠিক অবস্থান থেকে। আর তা হল, 'শরীয়তের বিধানাবলী এসেছে যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করতে ও তা যথাসম্ভব পরিপূর্ণতায় পৌঁছাতে। এমনিভাবে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করতে এবং সেগুলো যথাসম্ভব হ্রাস করতে। আর

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নির্দেশটিও এর অন্তর্ভুক্ত'। এ পর্যন্ত তাদের কথা ঠিকই আছে।

তবে এরপর তারা মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে জালিম শাসকের জুলুমের প্রতিরোধ করার সঙ্গে কিয়াস করে অগ্রসর হয়। এরপর তারা এমন সব বক্তব্য প্রদান করে, যেগুলোর স্বপক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত সালাফের কারও বক্তব্য তারা দেখাতে পারবে না। আর তাদের এ ভুলের ফলে ইসলামী অঙ্গনে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। তারা যদি এ বিষয়ে সালাফের আদর্শের উপর থাকত তবে এ মতবিরোধ করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না।

তাওহীদ ও জিহাদপন্থীদের সামনে বিকৃতভাবে মাসলাহা-মাফসাদাহর স্লোগান তোলা হয় এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণকে তাওহীদ ও জিহাদের পথ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

সংক্ষিপ্তভাবে তাদের ভুলগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ:

'মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' একটি আত্মরক্ষামূলক জিহাদ যা (শরীয়ত কর্তৃক) নির্দেশিত। এটি উম্মাহর সকলের জন্য ফরযে আইন, কাজেই কিছু সংখ্যকের আমল দ্বারা সকলের ফরয আদায় হবে না। আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী রহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেন-

'কুফরের কারণে ইমাম অপসারিত হবে- এটা সর্বসম্মত মত। সুতরাং এ ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানের পদক্ষেপ নেয়া (জিহাদ করা) ওয়াজিব। সুতরাং অপসারণ করতে যে সক্ষম হবে সে সাওয়াব লাভ করবে, আর যে অপারগ হবে তাকে হিজরত করতে হবে, আর যে এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে গুনাহগার হবে'।

কুরআনের যেসব আয়াত এবং যেসব হাদীসে কুফফার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়, মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়টি সেগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নির্দেশ কোথাও আসেনি। (হ্যাঁ, কুরআন-সুন্নাহ'র কিছু বক্তব্যের ব্যাপকতায় তার জুলুম প্রতিহত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়।) বরং কিছু আম নুসূসে জালিম মুসলিম শাসকের জুলুম প্রতিরোধ করার কথা আসে। এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে নির্দেশনা হল, ধৈর্যধারণ করা। আর মুসলিম জালিম শাসকের জুলুমকে প্রতিহত করতে গেলে যদি আরও বড় জুলুমের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। তাছাড়া জুলুম প্রতিরোধ করা মানে বাইয়াত ভঙ্গ করা নয়। অর্থাৎ কেউ জালিম শাসকের জুলুম প্রতিহত করার দ্বারা তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়াও সাব্যস্ত হয় না।

তাহলে কোনো মূলনীতির আলোকে জালিম মুসলিম শাসকের জুলুম প্রতিরোধের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম আমভাবে যেসব নিয়ম উল্লেখ করেন, সেগুলোর সঙ্গে মুরতাদ শাসক কিংবা কাফের আসলির বিরুদ্ধে জিহাদের কিয়াস করা যায়?

সুতরাং মুসলিম জালিম শাসকের জুলুম প্রতিহত করা সংক্রান্ত যেসব নীতিমালা উলামায়ে কেরাম নির্ণয় করেন, সেগুলোকে কাফের বা মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের সঙ্গে কীভাবে মিলানো যেতে পারে?

জিহাদের ময়দানে প্রাণহানী এবং পরাজয়ের আশঙ্কা আছে, কিন্তু এই আশঙ্কা কখনই এমন মাফসাদাহ (অকল্যাণ) হিসাবে বিবেচিত হয়নি, যার কারণে জিহাদকে বিলম্বিত করা যায়। স্কুলের ছাত্রও এ কথা বোঝে।

মুরতাদ শাসকের অধীনে বসবাসের ফলে যে ক্ষতি বা অকল্যাণ হয়, তা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষতির চেয়ে অনেক অনেক বেশি। অন্য দিকে জালিম মুসলিম শাসকের অধীনে বসবাস করার ক্ষতি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে হওয়া ক্ষতির তুলনায় কম।"

শাইখ আবু বকর নাজীর বক্তব্য এখানে শেষ।

এর চেয়ে বড় মাফসাদা কি?

একটি দেশ পরিচালিত হচ্ছে গাইরুল্লাহর আইন দিয়ে। সে দেশের শাসক সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে। এ কুফরী আইন বিলুপ্ত করে শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং এ মুরতাদ শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে মুসলিম শাসকের হাতে দেশকে ন্যস্ত করা এটা মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব বলেন, এটা করতে গিয়ে যদি এর চেয়ে বড় মাফসাদার আশঙ্কা থাকে তাহলে এ কাজগুলো করবে না। আবার তিনি এ ক্ষেত্রে থানভী রহিমাহুল্লাহর উক্তিও টেনে আনেন। থানভী রহিমাহুল্লাহর নিজের লেখায় এ কথা আছে কি না? তা আমরা পরবর্তী শিরোনামে ইনশাআল্লাহ দেখব।

এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মুসলমানের জীবনে এর চেয়ে বড় মাফসাদা কি? মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' কিতাবের দুটি সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা ইতিমধ্যে এ নিবন্ধেই উল্লেখ করেছি। একটি বক্তব্যে তিনি বলেন, একটি দেশ দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য তার শাসক মুসলমান হওয়া জরুরি-সে দেশের আইন শরয়ী? না কি গায়রে শরয়ী? তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আরেকটি বক্তব্যে বলেন, শাসক কাফের-মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। কারণ এতে বাহিরের কুফরী শক্তি এসে দেশ দখল করতে পারে।

এতে ফলাফল কি দাঁড়াল? কোটি কোটি মুসলমান কুফরী আইনের অধীনে কাফের-মুরতাদ শাসকের আনুগত্য করে যাবে। আর একে বলা হবে 'সবর', একে বলা হবে 'দুনিয়াবিমুখতা', একে বলা হবে, 'মাসলাহাত'।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব যে বড় 'মাফসাদা'র ভয়ে গায়রে শরয়ী আইন ও কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দিচ্ছেন না, সে বড় মাফসাদা কি? তিনি বলেন, বাহিরের কুফরী শক্তি এসে দেশ দখল করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাহিরের কুফরী শক্তি দেশ দখল করার পর তো এই হবে যে, দেশ গায়রে শরয়ী আইনে চলবে এবং দেশের প্রধান কাফের হবে। বিদ্রোহ না করলেও তা-ই হচ্ছে। পার্থক্য হল, বিদ্রোহ না করলে গায়রে শরয়ী আইন ও কাফের-মুরতাদের অধীনে দেশ চলাটা নিশ্চিত এবং চলমান বাস্তবতা। আর বিদ্রোহ করলে তা হবে সম্ভাব্য। নিশ্চিতও নয়, চলমান বাস্তবতাও নয়। তাহলে আমরা কোনটাকে বড় মাফসাদা বলব?

দ্বিতীয় কথা এবং মূল কথা হচ্ছে, মুফতী সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে কোনো দলীল দেননি। তিনি যত দলীল দেন, যত ঘটনা বর্ণনা করেন সবই হচ্ছে ফাসিক ও জালিম শাসক সম্পর্কে। এমনকি থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর যে উক্তি দেন তাও ফাসিক ও জালিম শাসক সম্পর্কে। তাই এ দুটির পার্থক্য না করে হুকুম বলে দেয়াটা কেমন হল?!

এবার আমরা থানভী রহিমাহুল্লাহর নিজের বক্তব্যগুলোও একটু দেখি।

থানভী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য

থানভী রহিমাহুল্লাহর যে বক্তব্যগুলো 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাজরিয়াত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়, তার কিছু আমরা উল্লেখ করেছি। আর কিছু বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি যে, সেগুলো তাঁর বক্তব্য কি না, সে কারণে তাঁর নিজের লেখা থেকে এ বিষয়ক বক্তব্যগুলো উল্লেখ করছি। ইমদাদুল ফাতাওয়ার সঙ্গে ছাপা তাঁর 'জাজলুল কালাম ফী আজলিল ইমাম' কিতাব থেকে তাঁর বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে। ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫ম খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় আলোচ্য কিতাবে থানভী রহিমাহুল্লাহ রাষ্ট্রপ্রধানের শরীয়ত বিরোধী অবস্থান এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সাতটি অবস্থাকে একটি নকশা করে দেখান। তিনি সেখানে সাতটি ভাগ এভাবে করেন-

اولا وہ اقسام بشکل جدول بھي اور عبارت میں بھي لكھے جاتے ھیں، اس كےبعد احكام ذكر كئے جاویں گے، وہ اقسام یہ ھیں:

امر مخل بالامامت

١ –اختياري يعني خلع بلا سبب

٢ –غير اختياري مثل مرض مانع عن العمل واسر ممتد وعجز عن العمل

٣ –كفر

٤ –غير متعدي الى الغير مثل شرب خمر وغيره

٥ –متعدي يعني ظلم باخذ الاموال اجتهادي

٦ –متعدي يعني ظلم باخذ الاموال غير اجتهادي

٧ –بالاكراه على المعصية

.....

قسم ثالث:– نعوذ بالله كافر ھو جاوے، خواہ بكفر تكذيب وجحود وخواہ بكفر عناد ومخالفت خواہ بكفر استخفاف واستقباح امور دین....

.....امداد الفتاوي ١٢٩/٥

قسم ثالث کا حکم: معزول ہو جاوے گا اور اگر جدا نہ ہو بشرط قدرت جدا کر دینا علی الاطلاق واجب ہے– لقوله في العبارة الثالثة كالردة– مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کفر متفق علیہ ہو، بدلیل الحدیث الأول کفرا بواحا عندکم من الله فیه برهان مع انضمام الإجماع المذکور سابقا. اور جس طرح اس کا کفر ہونا قطعي ہو اسي طرح اس کا صدور بھي یقیني ہو، مثل رویت عین کے نہ کہ محض روایات ظنیہ کے درجہ میں، کما دل علیه قوله علیه السلام: إلا أن تروا لمراد روية العين، بدليل تعديته إلى مفعول واحد. ص:۱۳۳، امداد الفتاوي ۱۳۳/۵

অনুবাদ: "প্রথমে সে প্রকারগুলো একটি নকশায়ও দেখানো হচ্ছে এবং লিখেও দেয়া হচ্ছে। এরপর সেগুলোর হুকুম উল্লেখ করা হবে। প্রকারগুলো এই-

রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বাধাগুলো

প্রথমত, নিজ ইচ্ছায় অর্থাৎ কোনো কারণ ছাড়াই ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো।

দ্বিতীয়ত, ইচ্ছা বহির্ভূত ওজর। যেমন এমন অসুস্থতা যা কাজ করতে বাধা দেয়, দীর্ঘমেয়াদি বন্দী অবস্থা ও কাজ করতে অক্ষমতা।

তৃতীয়ত, কুফর।

চতুর্থত, অপরকে স্পর্শ করে না এমন গুনাহ ও অপরাধ। যেমন মদপান ইত্যাদি

পঞ্চমত, অপরকে স্পর্শ করে এমন গুনাহ ও অপরাধ। অর্থাৎ জুলুম। মানুষের সম্পদ দখল করা। (ইজতিহাদী)।

ষষ্ঠত, অপরকে স্পর্শ করে এমন গুনাহ ও অপরাধ। অর্থাৎ জুলুম। মানুষের সম্পদ দখল করা। (গায়রে ইজতিহাদী)।

সপ্তমত, অপরকে গুনাহ করতে বাধ্য করার অপরাধ।

.....

তৃতীয় প্রকার: নাউজুবিল্লাহ! যদি কাফের হয়ে যায়। চাই তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার দ্বারা হোক বা অস্বীকার করে হোক। চাই হঠধর্মিতা ও বিরোধিতা করে হোক বা দ্বীনী বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ও নিন্দা করে হোক। .....।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১২৯

.....

তৃতীয় প্রকারের হুকুম: ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। সামর্থ্য থাকার শর্তে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। তৃতীয় ইবারত: 'যেমন মুরতাদ হওয়া' বক্তব্যের ভিত্তিতে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, কুফর যেন সর্বসম্মত কুফর হয়। কারণ প্রথম হাদীসে এসেছে, 'সুস্পষ্ট কুফর যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ আছে'। পাশাপাশি এর পক্ষে ইজমাও আছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়। আর যেমনি কুফরটি অকাট্য কুফর হওয়া জরুরি, তেমনি ব্যক্তি থেকে তা প্রকাশ পাওয়াও নিশ্চিত হতে হবে। যেমন চোখে দেখা। ধারণা নির্ভর বর্ণনা পর্যায়ের নয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের إلا أن تروا কথাটি দ্বারা চোখে দেখাই উদ্দেশ্য। এর দলীল হচ্ছে, এখানে শব্দটিকে এক মাফঊলের দিকে মুতাআদ্দী করা হয়।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩৩

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে থানভী রহিমাহুল্লাহর উক্তি দিয়ে যে দুটি শর্তের ব্যাপক প্রচার করা হয়: প্রথমত, অপসারণের সামর্থ্য থাকা। দ্বিতীয়ত, অপসারণ করতে গিয়ে আরও বড় ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকা। -এ দুটির প্রথমটির উল্লেখ তাঁর বক্তব্যে আছে। কিন্তু দ্বিতীয়টির উল্লেখ তাঁর বক্তব্যে নেই। আর দ্বিতীয় শর্তটির উপর মুফতী তাকী উসমানী সাহেব অত্যন্ত জোরদার আলোচনা করতে

গিয়ে এ কথা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে কুফরে বাহওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া গেলেও বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। পক্ষান্তরে থানভী রহিমাহুল্লাহ এ অবস্থায় বিদ্রোহ করাকে ওয়াজিব বলেন।

হ্যাঁ, থানভী রহিমাহুল্লাহ সামর্থ্যের শর্ত উল্লেখ করে এবং সঙ্গে আরও দুটি কথা বলেন। একটি হচ্ছে, কুফর নিশ্চিত কুফর হতে হবে এবং তা রাষ্ট্রপ্রধান থেকে প্রকাশ পাওয়াও নিশ্চিত হতে হবে। থানভী রহিমাহুল্লাহ-এর এ তিনটি কথা নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব ইনশাআল্লাহ। তবে এর আগে সংক্ষেপে বলতে চাই যে, মুফতী তাকী উসমানী সাহেব থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর উক্তি দিয়ে বিদ্রোহের মাসআলায় যে ফলাফলে পৌঁছান তার সঙ্গে থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর এ কথাগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাঁর কথা থেকে এ ধরনের ফলাফল বের হওয়ার কোনো সুযোগও নেই।

কাফের-মুরতাদ শাসক সম্পর্কে থানভী রহিমাহুল্লাহর উক্তিগুলো:

থানভী রহিমাহুল্লাহ এ তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ কুফরের ও ইরতিদাদের প্রকার উল্লেখ করে তার সঙ্গে হাদীস ও ফিকহের উক্তিগুলো উল্লেখ করেন। তাঁর উল্লেখ করা উক্তিগুলো যথাক্রমে এই-

العبارة الثالثة: قال في شرح المقاصد: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة، كالردة والجنون المطبق وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه، وكذا بالمرض الذي ينسيه المعلوم وبالعمي والصمم والخرس، وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين، وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه، وعليه يحمل خلع الحسن نفسه. وأما خلعه بنفسه بلا سبب ففيه خلاف، وكذا في انعزاله بالفسق، والأكثرون على أنه لا ينعزل وهو المختار من مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن محمد روايتان، ويستحق العزل بالاتفاق. اهـ. إمداد الفتاوى ٥/١٣١

অনুবাদ: "তৃতীয় উক্তি: শরহুল মাকাসিদের রচয়িতা বলেন, এমন কারণ পাওয়া গেলে ইমামুল মুসলিমীন হওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি হয়ে যাবে যেসব কারণে ইমামুল মুসলিমীন হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যায়। যেমন: মুরতাদ হয়ে যাওয়া, স্থায়ীভাবে পাগল হয়ে যাওয়া, শত্রুর হাতে এমনভাবে বন্দী হওয়া যে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো আশা নেই। এমনিভাবে এমন অসুস্থতা যা সকল জানা বিষয়কে ভুলিয়ে দেয়। অন্ধত্ব, বধিরতা ও বোবা হয়ে যাওয়া। এমনিভাবে মুসলমানদের জরুরি চাহিদাগুলো পূরণ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপ্রধান নিজে নিজে অব্যাহতি গ্রহণ করা। তার অক্ষমতা যদি প্রকাশ্য বোঝা নাও যায়; বরং সে নিজে নিজে অনুভব করে। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু যে নিজেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন তাকে এ হিসাবেই ধরে নেয়া হবে। আর যদি কোনো ইমামুল মুসলিমীন কোনো কারণ ছাড়া নিজেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। এমনিভাবে ফাসিক হওয়ার কারণে অব্যাহতি করার ক্ষেত্রেও। অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে, এ কারণে তার অব্যাহতি হবে না। শাফেয়ী ও আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর মাযহাবে এটাই গ্রহণযোগ্য। এ সুরতে ইমাম মুহাম্মদ রহিমাহুল্লাহ থেকে দুটি বর্ণনা আছে। বাকি সবার মতানুসারে তাতে অব্যাহতি দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

كما بسطه في أول المرتد من الدر المختار ورد المحتار، ولنقتصر على نقل بعض العبارة منه. قال في المسايرة: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب، أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، كترك السجود لصنم، وقتل نبي والاستخفاف به، وبالمصحف والكعبة.

وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود.

ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان فهو حينئذ التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الأمور، تكون مع تحقق التصديق والإقرار ، ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه ا هـ.

قلت : ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به ، وإن لم يقصد الاستخفاف.

إمداد الفتاوى٥/١٢٩-١٣٠

অনুবাদ: "যেমন আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতারে মুরতাদের বয়ানের শুরুতে বিস্তারিত বলেন। আমরা সেখান থেকে কিছু ইবারত উল্লেখ করব। মুসায়ারায় বলেন, মোটকথা, ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অন্তর দিয়ে সত্যায়ন অথবা অন্তর ও জবানে সত্যায়নের সঙ্গে সে বিষয়গুলোকেও যুক্ত করেন যা সত্যায়নের পরিপন্থী হওয়ার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে ঈমান পরিপন্থী। যেমন: মূর্তিপূজা ছাড়তে হবে, কোনো নবীকে হত্যা করা ছাড়তে হবে এবং নবী, মুসহাফ ও কাবার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়তে হবে।

এমনিভাবে শরীয়তের সর্বসম্মত কোনো বিষয়কে জানার পরও তার বিরোধিতা করা বা তা অস্বীকার করা। কেননা এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, এখানে তাসদীক-সত্যায়ন নেই।

এরপর তিনি এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন যে, এ বিষয়গুলোর দ্বারা ঈমানের মর্মের কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে সেখানে তাসদীক-সত্যায়ন, স্বীকৃতি ও উল্লিখিত বিষয়গুলো দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া। এর দলীল হচ্ছে, এ বিষয়গুলোর কোনো কোনটি এমন যা তাসদীক-সত্যায়ন ও স্বীকৃতির সঙ্গে পাওয়া যায়। এরপর তিনি বলেন, অবজ্ঞার বিপরীত সম্মান প্রদর্শন ধর্তব্য করার

কারণে হানাফী উলামায়ে কেরাম অনেক শব্দ ও কাজের ভিত্তিতে তাকফীর করেন-কাফের বলেন, যে শব্দ ও আচরণগুলো বিদ্রূপকারী ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারীদের থেকে প্রকাশ পায়। কেননা সে শব্দ ও আচরণগুলো অবজ্ঞাকে প্রমাণ করে। যেমন: ইচ্ছা করে অযু ছাড়া সালাত পড়া। বরং সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনমূলক তা নিয়মিত তরক করা; এ কারণে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অতিরিক্ত করেন, অথবা তাকে খারাপ মনে করার দ্বারা। যেমন কোনো ব্যক্তি অপরকে নিন্দা করতে গিয়ে পাগড়ীর কিছু অংশ তার কণ্ঠের নিচে রাখল, অথবা মোচ লম্বা করা।

আমি বলি, এর দ্বারা বোঝা যায়, যে কথা-কাজ অবজ্ঞার আলামত বহন করে, তা প্রকাশ পাওয়ার দ্বারা কাফের বলা হবে। যদিও সে অবজ্ঞা উদ্দেশ্য না করে থাকে।" ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১২৯-১৩০

জালিম-ফাসিক বিষয়ে থানভী রহিমাহুল্লাহর উক্তিগুলো:

থানভী রহিমাহুল্লাহ এ তৃতীয় প্রকারের আগে পরে জালিম শাসক ও ফাসিক শাসকের বিভিন্ন প্রকার ও সেগুলোর হুকুম উল্লেখ করেন এবং সে পক্ষে হাদীস ও ফিকহের উক্তিও উল্লেখ করেন। তাঁর উল্লেখ করা সে উক্তিগুলো যথাক্রমে এই-

العبارة الرابعة: وقال في المسايرة: وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل، ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة. أهـ. إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: "চতুর্থ ইবারত: মুসায়ারার মধ্যে বলেন, যদি কোনো ন্যায়পরায়ণের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করে, এরপর সে জুলুম ও অপরাধ শুরু করে তাহলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে না, তবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, যদি কোনো ফিতনা সৃষ্টি না হয়।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

العبارة الأولى: في الدر المختار: باب الإمامة: يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة. في رد المحتار ويعزل به أي بالفسق لو طرأ عليه، المراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا، ولذا لم يقل: ينعزل. اهـ. إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: "প্রথম ইবারত: দুররে মুখতারে আছে, বাবুল ইমামাহ: ফাসিকের আনুগত্য মাকরূহ্, ফাসিকীর কারণে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়া হবে, তবে ফিতনা সৃষ্টি হলে নয়। রাদ্দুল মুহতারে আছে, যদি সে ফিসক শুরু করে তাহলে তার এ ফিসকের কারণে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, যেমন ইতিপূর্বে তুমি জানতে পেরেছ। আর সে কারণেই ينعزل 'নিজে নিজে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে' বলেননি।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

العبارة الثانية: في الدر المختار: باب البغاة: فإن بايع الناس الإمام ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماما، فإذا صار إماما فجار لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة لعوده بالقهر فلا يفيد، وإلا ينعزل به، لأنه مفيد. خانية. وتمامه في كتب الكلام. في رد المحتار قوله: فلا يفيد أي لا يفيد عزله. قوله: وإلا ينعزل به أي إن لم يكن له قهر ومنعة ينعزل به أي بالجور.اهـ. إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: "তৃতীয় ইবারত: দুররে মুখতারে আছে, বাবুল বুগাত: যদি মানুষ ইমামুল মুসলিমীনের হাতে বায়আত হয়, কিন্তু সে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের মাঝে তার হুকুম প্রয়োগ হয় না, এমন হলে সে ইমামুল মুসলিমীন সাব্যস্ত হবে না। অতঃপর সে ইমামুল মুসলিমীন হয়ে জুলুম শুরু করলে, তার যদি নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য থাকে তাহলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে না; কারণ তার নিয়ন্ত্রণশক্তি ফিরে এসেছে, সুতরাং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কোনো লাভ নেই। আর তা না হলে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে; কেননা তা ফায়দাজনক। খানিয়াহ। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আকীদার কিতাবে

আছে। রাদ্দুল মুহতারে আছে: তাঁর কথা 'কোনো ফায়দা দেবে না' অর্থাৎ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে কোনো ফায়দা নেই। আর তাঁর কথা 'নচেত সে কারণে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে' অর্থাৎ যদি তার নিয়ন্ত্রণশক্তি ও প্রতিরোধশক্তি না থাকে, তাহলে সে কারণে অর্থাৎ জুলুমের কারণে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

العبارة الخامسة: وفي المواقف وشرحه: إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلالها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين. هـ. إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: "পঞ্চম ইবারত: মাওয়াকিফ ও শরহুল মাওয়াকিফ এ আছে, সাধারণ মুসলমানরা ইমামুল মুসলিমীনকে ক্ষমতাচ্যুত ও অপসারণ করতে পারবে, যদি অপসারণ করার মতো কোনো কারণ পাওয়া যায়। যেমন তার মাঝে এমন কিছু পাওয়া গেল যার দরুন মুসলমানদের সমস্যা হয় এবং দ্বীনের বিষয়াদি অবনতির দিকে ধাবিত হয়। যেমন মুসলমানদেরই দায়িত্ব হচ্ছে, দ্বীনের বিষয়গুলো সুশৃঙ্খল ও কার্যকরী করার জন্য ইমামুল মুসলিমীন নিয়োগ করা এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর যদি তাকে অপসারণ করতে গেলে ফিতনা দেখা দেয়, তাহলে দুই ক্ষতির সহজটিকে গ্রহণ করবে।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

এ বর্ণনাগুলোর দাবি

আমরা দেখলাম এবং আশা করি বুঝতে পেরেছি যে, থানভী রহিমাহুল্লাহর লেখায় কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার বর্ণনাগুলো এবং ফাসিক ও জালিম

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার বর্ণনাগুলো সম্পূর্ণই আলাদা ও সুস্পষ্ট, যার মাঝে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নেই। বিশেষ করে কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের ক্ষেত্রে ফিতনা সৃষ্টি হওয়া না হওয়া বিষয়ক কোনো কথা থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর নিজের বক্তব্যেও নেই এবং তিনি যেসব উক্তি উল্লেখ করেন তাতেও নেই। রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণ করতে গেলে যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাকে অপসারণ করবে কি করবে না -এ আলোচনা শুধুই জালিম ও ফাসিক শাসকের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর ইবারতেও এবং তাঁর উল্লেখ করা বর্ণনাগুলোতেও।

দুর্ভাগ্যক্রমে দুটির মাঝে তালগোল পাকিয়ে কাফের-মুরতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার বর্ণনাগুলোকে ফাসিক ও জালিম রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও উক্তির মধ্যে গুলিয়ে ফেলে, কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধানকে বেমালুম ভুলিয়ে দেয়া হয় এবং সবার হুকুমকে পরস্পরে একাকার করে দিয়ে জালিম-ফাসিক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার উক্তিগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করার চেষ্টা করা হয়। ফলাফল নিয়ে দাঁড় করানো হয়, কোনো অবস্থাতেই বিদ্রোহ করা যাবে না। কাফের-মুরতাদ, জালিম-ফাসিক কারও বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা যাবে না। এবং এর কারণ হিসাবে সম্ভাব্য এমন একটি ফিতনার কথা বলা হচ্ছে, যে ফিতনার আশঙ্কা মানব মন থেকে কখনও যাবে না। কিন্তু একটি বায়বীয় শর্তের ভিত্তিতে একটি বায়বীয় আশঙ্কাকে পুঁজি করে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধানকে চিরতরে মাটিচাপা দিয়ে দেয়া হয়।

এ কাজগুলো যাঁদের কলমে অনিচ্ছাকৃতভাবে হল, আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর যারা ইচ্ছা করেই কাজগুলো করল, আল্লাহ তাঁদেরকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন।

ফলাফল:

আমরা এখানে দুটি ফলাফল দেখাবো ইনশাআল্লাহ। একটি হচ্ছে থানভী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ও তাঁর উক্তিগুলোর ফলাফল। আরেকটি হচ্ছে থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর নামে যে দুটি শর্তকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় তার ফলাফল।

থানভী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ও তাঁর উল্লেখ করা উক্তিগুলো সম্পর্কে আমরা পাঠকবর্গকে বলতে চাই, তাঁর নিজের বক্তব্যগুলো এবং তাঁর উল্লেখ করা বর্ণনাগুলো আপনারা বার বার দেখুন। তাঁর নিজের কিতাব থেকে দেখুন। কাফের ও মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে তিনি একটি শর্ত উল্লেখ করেন, আর তা হচ্ছে বিদ্রোহের সামর্থ্য থাকা। বিদ্রোহ করতে গেলে ফিতনা সৃষ্টি হবে কি না -এসব বিষয়ে চিন্তা করার কথা বলা হয়নি। এমনিভাবে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষয়ে তিনি যে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেন, সেগুলোতে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে ফিতনার কোনো আশঙ্কাকে বিবেচনায় রাখা হয়নি। এমন কোনো আশঙ্কার উল্লেখই নেই।

অতএব তাঁর বক্তব্য এবং তাঁর দেয়া উক্তিগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, মুসলমানদের জন্য কাফের-মুরতাদ শাসকের অধীনে জীবন যাপন করার চেয়ে বড় আর কোনো ফিতনা নেই, যে ফিতনা

থেকে বাঁচার ভয়ে কাফের-মুরতাদ শাসকের অধীনস্থতাকে মেনে নিতে হবে।

পক্ষান্তরে থানভী রহিমাহুল্লাহর নামে যে বায়বীয় শর্তটিকে প্রচার করার চেষ্টা করা হয়, অর্থাৎ অন্য কোনো ফিতনার আশঙ্কা থাকলে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ করবে না -এ শর্তের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে আমরা বলতে পারি, কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত, উম্মত যে বিষয়টিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে, শরীয়তের সে সিদ্ধান্তকে এবং একটি অকাট্য ফরয দায়িত্বকে আটকে দেয়া হল এমন একটি বায়বীয় শর্ত দিয়ে, কুরআনে, হাদীসে, ফিকহে ও উম্মতের আমলের মাঝে যে শর্তের কোনো অস্তিত্ব নেই।

সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে বলতে বলতে এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলা হয় যে, কাফের-মুরতাদ শাসককে অপসারণ করার পর যদি মুসলমানরা পরস্পরে ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। সংশ্লিষ্ট পক্ষের এ দাবির আলোকে আমরা বলতে পারি, তাদের দৃষ্টিতে কাফের-মুরতাদ শাসকের অধীনে মুসলামানরা জীবন যাপন করা কোনো ফিতনার বিষয় নয়। আরও এক ধাপ এগিয়ে, এ পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট করে এ কথাও বলা হয় যে, একটি দেশ যদি গায়রুল্লাহর আইনেও চলে তবু তা দারুল ইসলাম হিসাবে বহাল থাকবে।

তাহলে ফলাফল দাঁড়াচ্ছে, দেশের আইন গায়রুল্লাহর আইন, দেশের শাসক কাফের-মুরতাদ। এমন অবস্থায় বিদ্রোহ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলো বড় কোনো ফিতনা নয়। শিরক,

শিরকের আইন ও শিরকের শাসন কোনোটিই বড় ফিতনা নয়। তাহলে বড় ফিতনা কি?! এটি একটি প্রশ্ন।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত

এ পর্যায়ে এসে মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি বর্ণনার মাধ্যমে শরীয়তের সিদ্ধান্তটি আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটি উক্তি হচ্ছে কাজী ইয়াজ রহিমাহুল্লাহর, আরেকটি হচ্ছে, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহর।

কাজী ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول.

قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

অনুবাদ: কাজী ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেরামের ইজমা হল নেতৃত্ব (ইমামাহ) কখনও কাফেরের হাতে অর্পণ করা যাবে না। আর যদি তার (ইমাম) থেকে কুফর প্রকাশিত হয় তবে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। এমনিভাবে সে যদি সালাত কায়িম করা এবং সালাতের দিকে ডাকা ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, এমনিভাবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে বিদআতের কারণেও সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, বসরার উলামায়ে কেরামের

কেউ কেউ বলেন, তার ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং তা বহাল থাকবে; কেননা সে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে করে।

কাজী ইয়াজ বলেন, সুতরাং যদি সে কুফর করে এবং শরীয়াহ পরিবর্তন করে অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো বিদআত প্রকাশিত হয়, তবে সে নেতৃত্বের অধিকার হারিয়ে ফেলবে এবং তার আনুগত্য পাবার অধিকার বাতিল হবে। তখন মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হবে তার বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা, তার পতন ঘটানো এবং তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে বসানো; যদি তারা (মুসলিমরা) সক্ষম হয়। যদি একটি দল (তাইফা) ব্যতীত অন্যান্য মুসলিমদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না হয়, তবে যে দলের (তাইফা) সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই কাফেরের (শাসকের) পতন ঘটানো অবশ্য কর্তব্য। আর যদি শাসক বিদআতী হয় তবে, তা ওয়াজিব হবে না, তবে যদি তারা (তাইফা) সক্ষম হবে বলে মনে করে তাহলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। আর যদি কেউই সক্ষম না হয় এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব নয়, তবে তখন মুসলিমদের সেই ভূমি থেকে অন্য কোথাও হিজরত করতে হবে, নিজেদের দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য।"

-শারহুন নববী আলা সাহীহি মুসলিম ১২/২২৯

ইমাম ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন-

وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا بما يغني عن إعادته وهو في كتاب الفتن وملخصه: إنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ١٢٣/١٣، المكتبة السلفية

অনুবাদ: "উবাদা ইবন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর হাদীস الأمر بالسمع والطاعة الا أن تروا كفرا بواحا -এর উপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়, যা পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তা করা হয় কিতাবুল ফিতানে, যার সারকথা হচ্ছে, ইজমা তথা ঐক্যমতে শাসক কুফরী করলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হবে। তখন যে তা করতে সক্ষম হবে সে সাওয়াব পাবে, যে মুনাফিকী করবে সে গুনাহগার হবে, আর যে অক্ষম হবে তার উপর সে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করা ওয়াজিব।" -ফাতহুল বারী শরহু সাহীহিল বুখারী, হাফেজ ইবনে হাজার, কিতাবুল আহকাম, باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية, ১২৩/১৩

কাজী ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ ও হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যগুলোতে একথা সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্রপধান কাফের হয়ে গেলে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করা তাদের প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। বিদ্রোহ করতে সক্ষম না হলে তারা কাফের রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে বসবাস না করে অন্যত্র হিজরত করবে। এ দুই কাজের বাইরে যে কাজটি আছে তা হচ্ছে মুনাফিকী। যারা বিদ্রোহও করবে না এবং হিজরতও করবে না, তারা মুনাফিক, মুদাহীন, কাফেরের চাটুকার ও পদলেহী।

থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর তিনটি কথা: সামর্থ্য, সুস্পষ্ট কুফর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ

কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে থানভী রহিমাহুল্লাহ তিনটি বিষয় আলোচনা করেন।

১. বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহকারীদের সামর্থ্য থাকতে হবে।

২. শাসকের কুফর সুস্পষ্ট কুফর হতে হবে।

৩. শাসক থেকে কুফরের প্রকাশটা নিশ্চিত হতে হবে।

আমরা এ তিনটি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব, যাতে কেউ এগুলোকে পুঁজি করে কোনো অসদুদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

সামর্থ্য:

এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, শরীয়তের একটি বিধানও এমন নেই যা সামর্থ্য না থাকলেও করতে হবে। প্রত্যেকটি বিধান পালন করা তখনই ওয়াজিব যখন সে বিধান পালন করার মতো সামর্থ্য থাকবে। সামর্থ্যের বাইরে কোনো আমল আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর ফরয করেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, জিহাদ, কিতাল, বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামর্থ্যের শর্তটিকে এত বেশি চর্চা করা হয়, যা অন্য কোনো আমলের ক্ষেত্রে করা হয় না। বরং জিহাদ, বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ইত্যাদির আলোচনা আসলে শর্তটির উল্লেখ করেই এ দায়িত্ব থেকে মুক্তির ফায়সালা করা হয়, কিন্তু বাস্তবে সামর্থ্য আছে কি না? তা দেখারও সুযোগ দেয়া হয় না। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিচারে সামর্থ্যের মানদণ্ড কী? দেড়শত কোটি মুসলমানের পৃথিবীতে কেন মুসলমানরা সামর্থ্যহীন? এবং সামর্থ্য নেই বলতে কেন আমাদের দায়িত্বশীলগণের মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না, বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

সামর্থ্যের মাপকাঠি

সামর্থ্য বিষয়ক আলোচনার সুবাদে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

এক. সামর্থ্যের জনবল।

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল।

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল।

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল।

পাঁচ. সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কী?

কুরআন-হাদীসের আলোকে ফিকহ-ফাতওয়ার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিষয়গুলো পরিষ্কার হলে আশা করি এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ধূম্রজাল সৃষ্টি করার আর সুযোগ থাকবে না।

এ বিষয়ে আয়াত হাদীস এবং ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করার আগে ছোট্ট একটি ভূমিকা তুলে ধরছি। দলীলগুলো বোঝার জন্য যা সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

একটি ছোট্ট ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন শেষ হয়ে যখন মাদানী জীবন শুরু হয় এবং মাদানী জীবনের কিছু অংশ পার হয় তখন মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়। প্রতিরোধ এবং আক্রমণ তাদের উপর ফরয করা হয়। বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছর মাদানী জীবনে 'দিফায়ী' বা প্রতিরোধমূলক জিহাদ ও 'ইকদামী' আক্রমণাত্মক জিহাদ দুটি বার বারই সংঘটিত হয়। অসংখ্য জিহাদের কোনো কোনোটি দিফায়ী ছিল, আর কোনো কোনোটি ইকদামী ছিল সে বিশ্লেষণে আমরা এখন যাচ্ছি না।

বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে জাইশে উসামা (রা) পর্যন্ত যত জিহাদ হয় এবং যত জিহাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করেন সবগুলো জিহাদের প্রস্তুতি ভূমি, আশ্রয় ভূমি ও পরিচালনা ভূমি ছিল সর্বোচ্চ জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ।

সুতরাং বদর যুদ্ধ থেকে জাইশে উসামা (রা) পর্যন্ত যতগুলো দিফায়ী ও ইকদামী জিহাদ মুসলমানদের উপর ফরয হয় সে জিহাদগুলো ফরয হওয়া অবস্থায় পুরো পৃথিবীর অবস্থা, মুসলমানদের প্রতি বিশ্ব কুফরী শক্তির বিদ্বেষের অবস্থা ও মুসলমানদের যে পরিস্থিতিগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেগুলো যথাক্রমে এই-

প্রথমত মুসলমানদের সংখ্যা ও ভূমি মদীনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থায়ও জিহাদ ফরয হয় এবং আরব উপদ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থায়ও জিহাদ ফরয হয়।

দ্বিতীয়ত, মদীনার বাইরে পুরো পৃথিবী যখন মুসলমানদের শত্রু তখনও জিহাদ ফরয হয় এবং জাজিরাতুল আরবের বাইরে পুরো পৃথিবী যখন মুসলমানদের শত্রু তখনও জিহাদ ফরয হয়।

তৃতীয়ত, রাসূলে আরাবীর মদীনার দশ বছরের জীবনে কখনও নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল না। জিহাদের ময়দানে যাওয়ার আগে পরে জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালনকারীদের কেউ ইলম শিখছেন, কেউ শেখাচ্ছেন, কেউ ব্যবসা করছেন, কেউ কৃষি কাজ করছেন, কেউ দিন-মজুর হিসাবে খাটছেন, কেউ উট বকরির খামার নিয়ে আছেন, কেউ রাখাল হিসাবে কর্মরত। জিহাদের ঘোষণা আসার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সবাই মুজাহিদ, এঁরা সবাই যোদ্ধা।

চতুর্থত, সাহাবায়ে কেরাম যখন জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালন কালে রাসূলে আরাবীর কাছে নিয়মতান্ত্রিক কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না, কিন্তু বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর কাছে নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী ছিল এবং লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা প্রস্তুত ছিল।

পঞ্চমত, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন জিহাদ ফরয হয় তখন তাঁর কাছে কোনো অস্ত্রের মজুদ ছিল না। নিজ নিজ পেশায় ও কাজে ব্যস্ত মুসলমানদের নিজস্ব সংগ্রহ ও নিজস্ব পাথেয়গুলো নিয়ে তাঁদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব তাঁরা পালন করতেন। আর যাদের সংগ্রহে ও সামর্থ্যের উপাদান বেশি থাকতো তাঁরা অন্যদেরকে সহযোগিতা করতেন।

ষষ্ঠত, আরবের মুষ্টিমেয় মুসলমানদেরকে আরব-অনারব তথা পৃথিবীর সকল কুফরী শক্তি তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্যও শত্রু মনে করতো এবং তাদের বাতিল ও ভ্রষ্ট ধর্মগুলোর ধর্মীয় স্বার্থের জন্যও শত্রু মনে করতো।

সপ্তমত, মদীনার মুষ্টিমেয় মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারকারী কুফরী শক্তির পদচারণা জাজিরাতুল আরবের উপকণ্ঠ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কোনো শক্তি মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠলে তার খবর রাখতো এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিতো।

অষ্টমত, আরবের মুষ্টিমেয় মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বের কুফরী শক্তিগুলো পরস্পরে একে অপরকে সহযোগিতা করতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করতো। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা তারা ব্যয় করতো।

নবমত, মদীনা ও আরবের মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন তাঁদের অস্ত্রের পরিমাণের তুলনায় বিশ্ব কুফরী শক্তির মজুদ অস্ত্রের পরিমাণ শুধু শত গুণ বা হাজার গুণ ছিল এমন নয়; বরং মুসলমানদের অস্ত্রের তুলনায় তাদের অস্ত্রের পরিমাণের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না।

দশমত, মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন তাদের মাঝে মুনাফিকের সংখ্যাও একেবারে নগন্য ছিল না। মুনাফিকদের এমন ভয়াবহ আচরণ ছিল যে, যুদ্ধের মুখোমুখি হতে গিয়েও তারা পিছু হটে চলে এসেছে। কিন্তু এরপরও জিহাদের ফরয বিধান অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল।

এগারোতম, এমন মুসলমানদের উপরও জিহাদের বিধান ফরয ছিল যাঁরা ঈমান আনার পর তখনও আমলগুলো শিখে শেষ করেননি। আমলগুলো বাস্তবায়ন করা শুরু করেননি।

বারোতম, এমন মুসলমানদের উপরও জিহাদের বিধান ফরয ছিল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের উপর বিভিন্ন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করেছিলেন।

তেরোতম, মদীনার দশ বছর জীবনে যখন জিহাদ ফরয হয় তখনও পৃথিবীতে গোয়েন্দাগিরির ব্যাপক প্রচলন ছিল। শত্রুরা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের প্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করতো।

চৌদ্দতম, খন্দকের যুদ্ধে শত্রু যখন মাদীনার চতুর্দিক ঘেরাও করে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, তখনও মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয ছিল, আবার মুসলামানরা যখন পনের দিনের সফরের দূরত্ব অতিক্রম করে তাবুকে যান এবং তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে যান, তখনও মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয ছিল।

পনেরোতম, বদর যুদ্ধের তিন শত তের জনের উপরও জিহাদ ফরয ছিল, ফাতহে মক্কার দশ-বার হাজারের উপরও জিহাদ ফরয ছিল এবং তাবুকের যুদ্ধের ত্রিশ হাজারের উপরও জিহাদ ফরয ছিল।

এ কয়েকটি সর্বসম্মত বিষয় সামনে রেখে আমরা আয়াত, হাদীস ও ফিকহে ইসলামীর আলোকে জিহাদের সামর্থ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সামর্থ্যের আলোচনা আসলে সাধারণত যে বিষয়গুলো আমাদেরকে আলোচনা নিয়ে সামনে বাড়তে দেয় না সেগুলো হচ্ছে:

এক. সামর্থ্যের জনবল।

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল।

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল।

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল।

এক. সামর্থ্যের জনবল

সামর্থ্যের এ অংশটি খুব স্পষ্ট। জিহাদের বিধানের শুরুর দিকে জনবলের হিসাব ছিল, প্রতি দশজন কাফেরের বিপরীতে একজন মুসলমান থাকলে তার জন্য দশজন কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ফরয। দুইশত কাফেরের বিরুদ্ধে বিশজন মুসলমানের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া ফরয ছিল। এক পর্যায়ে এ বিধানটি মানসুখ হয়ে দুজন কাফেরের বিরুদ্ধে একজন মুসলমানের লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে ফরয করা হয় এবং দুইশত কাফেরের বিরুদ্ধে একশত মুসলমানের লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে ফরয করা হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦) سورة الأنفال

অনুবাদ: "হে নবী, তুমি মুমিনদের যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত কর, তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোক যদি ধৈর্যশীল হয় তাহলে তারা দুশ লোকের উপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশত হয় তাহলে তারা এমন এক হাজার লোকের উপর জয় লাভ করবে যারা কুফরী করেছে। এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না। এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর বিধানকে হালকা করে দেন। কারণ তিনি জানেন, তোমাদের মাঝে কিছু দুর্বলতা আছে। অতএব তোমাদের থেকে যদি একশত ধৈর্যশীল মানুষ থাকে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা দুইশতর বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, আর যদি তোমরা এক হাজার ধৈর্যশীল হও তাহলে তাদের দুই হাজারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই আছেন।" (সূরা আনফাল ০৮:৬৫-৬৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة.

صحيح ابن خزيمة المتوفى سنة ٣١١هـ، كتاب المناسك، باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر، ١٢١٢/١، رقم الحديث: ٢٥٣٨، المكتب الإسلامي، تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، قال الأعظمي: إسناده صحيح

অনুবাদ: "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সফর সঙ্গী হিসাবে চারজন সর্বোত্তম, একটি কোম্পানি ও ব্রিগেডের জন্য চারশত সৈন্য সর্বোত্তম, একটি সেনাবাহিনীর জন্য চার হাজার সৈন্য সর্বোত্তম। আর সৈন্য সংখ্যা যদি বারো হাজার হয়ে যায়, তাহলে সৈন্যস্বল্পতার কারণে তারা কখনও হেরে যাবে না।" -সহীহ ইবনে খুযাইমা,

কিতাবুল মানাসিক, باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر হাদীস নং- ২৫৩৮ (হাদীসটির বর্ণনা সূত্র সহীহ।)

এ দুটি আয়াত ও হাদীসের আলোকে ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৪৮৩ হি :) বলেন-

والفرار من الزحف من الكبائر على ما قال صلى الله عليه وسلم: ''خمس من الكبائر لا كفارة فيهن'' وذكر في الجملة الفرار من الزحف وقال: ''إن من أعظم الموبقات الشرك بالله وأكل مال اليتيم والتولي يوم القتال وقذف المحصنات'' ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم.

وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المشركين لا يحل لهم أن يفروا كما قال الله تعالى: { إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ } الأنفال: ٦٢ ومن خبر الله أنه غالب فليس له أن يفر ثم خفف الأمر فقال: { الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ } إلى قوله: { فإِن يَكُن مِّنكُمْ مأة صَابِرَة يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ } الأنفال: ٦٦ وهذا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع.

وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة، إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفاً كلمتهم واحدة فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ''لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قلة'' ومن كان غالباً فليس له أن يفر. شرح السير الكبير للسرخسي المتوفى سنة ٤٨٣هـ، باب الفرار من الزحف ٨٩/١، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

অনুবাদ: "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহগুলোর একটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পাঁচটি বিষয় কবীরা গুনাহ যার কোনো ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়'। সে পাঁচটির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়াকেও উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের দিন পালিয়ে যাওয়া এবং সতী

নারীকে (যিনার) অপবাদ দেয়া'। সুতরাং মুসলমানদের সংখ্যা যদি মুশরিকদের সংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ হয় তাহলে তাদের জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়িয না।

শুরুতে বিধান ছিল, মুসলমানরা মুশরিকদের দশ ভাগের এক ভাগ হলে তাদের জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়িয না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি তোমাদের থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে তাহলে তারা দুইশত -এর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে।" (সূরা আনফাল ৬২) আর যার ব্যাপারে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, সে বিজয়ী হবে তার জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়িয না। এরপর বিধানটিকে হালকা করেন এবং বলেন, "এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে হালকা করে দেন" এ পর্যায়ে বলেন, "যদি তোমাদের থেকে একশত ধৈর্যশীল থাকে তাহলে তারা দুইশত -এর বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে।" (সূরা আনফাল ৬৬) আর এটা হচ্ছে যখন তাদের লড়াই করার মতো শক্তি থাকবে। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকবে। আর যার সঙ্গে অস্ত্র থাকবে না সে এমন ব্যক্তি থেকে পালিয়ে যেতে সমস্যা নেই যার সঙ্গে অস্ত্র আছে। আর এমন ব্যক্তি থেকে পালিয়ে যেতে কোনো সমস্যা নেই যে নিক্ষেপ করছে, যখন তার কাছে নিক্ষেপ করার মতো ব্যবস্থা থাকবে না। দেখো না! দুর্গের দরজা থেকে পালিয়ে যাওয়াও জায়িয আছে এবং এমন জায়গা থেকেও পালিয়ে যাওয়া জায়িয আছে যেখানে মিনজানিক দিয়ে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কেননা সে সেখানে অবস্থান করতে সক্ষম নয়।

এর আলোকেই তিন জনের সামনে থেকে একজন পালিয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই। তবে মুসলমানের সংখ্যা যদি বারো হাজার হয়ে যায়, যারা একমতের উপর আছে। তখন তাদের জন্য শত্রু থেকে পালিয়ে যাওয়া জায়িয নেই, শত্রুসংখ্যা যদি বেশিও হয়।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বারো হাজার কখনও সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।" আর যারা বিজয়ী হবে তাদের জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়িয না।" -শারহুস সিয়ারিল কাবীর, সারাখসী (মৃ:৪৮৩হি:), বাবুল ফিরার মিনাজ জাহাফ ১/৮৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

কামালুদ্দীন দামীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮০৮হি:) বলেন-

وحكى القرطبي في (تفسيره) أنهم إذا بلغوا اثني عشر ألفًا حرم الانصراف وإن زاد الكفار على مثليهم عند جمهور العلماء, منهم: مالك وأبو حنيفة وداوود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة) , وأنهم جعلوا ذلك مخصصًا للآية. النجم الوهاج في شرح المنهاج، للإمام العلامة المتقن المحدث الفقيه اللغوي كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري المتوفى ٨٠٨هـ، كتاب السير

অনুবাদ: "কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যা যখন বারো হাজারে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের জন্য ফিরে আসা হারাম। যদিও কাফেরদের সংখ্যা তাদের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি হয়। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মালিক, আবু হানীফা ও দাউদ রাহিমাহুমুল্লাহ। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বারো হাজার সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কখনও হেরে যাবে না'। এসকল উলামায়ে কেরাম এ হাদীসের আলোকে আয়াতের হুকুম থেকে (বারো হাজারের ক্ষেত্রে) এ হুকুমকে খাস ধরে নেন।

কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং এ দুয়ের আলোকে ফিকহে ইসলামীর বক্তব্য তথা একজন হানাফী ইমামের বক্তব্য থেকে আমরা যে কথাগুলো পেলাম তা যথাক্রমে-

প্রথমত, সামর্থ্যের ক্ষেত্রে জনবলের হিসাব হচ্ছে, মুসলমান যোদ্ধাদের বিপরীতে যদি অমুসলিম যোদ্ধা দ্বিগুণ হয়, তবু জিহাদ

করা ফরয এবং জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা জায়িয না। শত্রুসৈন্য দ্বিগুণের চাইতে বেশি হলে সংখ্যাগত বিবেচনায় পালিয়ে আসা জায়িয আছে।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যার বিধানটি কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে, কারণ এটাই শেষ বিধান যাকে মানসুখ-রহিত করে আর কোনো বিধান আসেনি।

তৃতীয়ত, পরবর্তী উম্মতের বিভিন্ন রকমের দুর্বলতা ও সীমবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন।

চতুর্থত, মুসলমানদের সংখ্যা বারো হাজার হয়ে যাওয়ার পর, শত্রুসংখ্যা যাই হোক তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পালিয়ে যাওয়া জায়েয নেই।

পঞ্চমত, এমন কোনো পরিস্থিতি যদি এসে যায় যে, কোনো নিরস্ত্র মুসলমান সশস্ত্র শত্রুর সামনে পড়ে গেছে, তাহলে তার জন্য পালিয়ে আসা জায়িয আছে।

ষষ্ঠত, ইমাম আবু হানীফা, মালিক রহিমাহুল্লাহসহ জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, মুসলমানদের সংখ্যা বারো হাজারে পৌঁছে গেলে শত্রুসংখ্যা দ্বিগুণ হোক বা তার চেয়ে বেশি হোক সর্বাবস্থায় মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল

সামর্থ্যের ক্ষেত্রে জনবলের বিষয়টিকে আয়াতে, হাদীসে ও ফিকহে ইসলামীতে যেভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়, সামর্থ্যের অর্থবলের

বিষয়টিকে সেভাবে বলা হয়নি। এ থেকে আমরা দুটি বিষয় উদ্ধার করতে পারি-

প্রথমত, জিহাদের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের মূল বিষয় হচ্ছে জনবল, অর্থবল মুখ্য কোনো বিষয় নয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থবলের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই যা অর্জিত হলে জিহাদ করবে, না হয় জিহাদ করবে না। বরং অর্থবলের মাপকাঠিতে বলা হয়, প্রত্যেক মুজাহিদ তার সামর্থ্যের সবটুকু ব্যয় করে জিহাদে শরীক হবে।

এছাড়া আয়াত, হাদীস, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস থেকে যে কয়েকটি বিষয় খুবই স্পষ্ট হয় সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

প্রথমত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলামানদের উপর জিহাদ ফরয করার ক্ষেত্রে যেমন তাদের প্রাণ বিসর্জন দেয়ার জন্য আদেশ করেন, তেমনি তাদের মাল ও সম্পদও ব্যয় করার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١) سورة التوبة

অনুবাদ: “তোমরা হালকা ও ভারি অবস্থায় বের হয়ে যাও এবং তোমাদের মাল-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান।” (সূরা তাওবা ০৯:৪১)

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে আসে-

عن أنس رضي اللهُ عنهُ أَنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: جاهدوا المشْركين بأموالكُمْ وأنفسكم وألسنتكمْ. رواهُ أحمد والنسائيُّ وصحّحهُ الحاكمُ، إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم

অনুবাদ: "আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল-সম্পদ দিয়ে, তোমাদের প্রাণ দিয়ে এবং তোমাদের জবান দিয়ে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১২২৬৮)

তৃতীয়ত, কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বলেন-

الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو: بالخروج والمباشرة للكفار، وبالمال وهو: بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه.

وهذا هو المفاد من عدة آيات في القرآن {جاهدوا بأموالكم وأنفسكم}. سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، كتاب الجهاد

অনুবাদ: "হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, জান দিয়ে জিহাদ করা ফরয। আর তা হচ্ছে জিহাদে বের হওয়া এবং কাফেরদের মুখোমুখি হওয়া। এমনিভাবে মাল-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা ফরয। আর তা হচ্ছে মাল-সম্পদ খরচ করা, যা জিহাদের অস্ত্র ইত্যাদির খরচে ব্যবহার করা হবে। কুরআনের একাধিক আয়াত যেমন جاهدوا بأموالكم وأنفسكم থেকে এ কথাই বের হয়ে আসে"। -সুবুলুস সালাম, কিতাবুল জিহাদ

চতুর্থত, সীরাত থেকে পাওয়া যায়, মুসলমানদের যখন নিয়মতান্ত্রিক বাইতুল মাল ছিল না, তখন মুজাহিদগণ তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে জিহাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এছাড়া মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয় তখন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বাইতুল মালের কোনো ব্যবস্থা ছিল না; বরং এর কোনো অস্তিত্বও ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁদের উপর জিহাদ ফরয ছিল। যা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পদগুলো

জিহাদের জন্য অর্থবল হিসাবে বিবেচিত। আর্থিক সামর্থ্য সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সমৃদ্ধ বাইতুল মাল থাকা জরুরি নয়।

পঞ্চমত, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফিকহে হানাফীতে জিহাদের জন্য অর্থবল ও অর্থ খরচের বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়-

[تنبيه] من قدر على الجهاد بنفسه وماله لزمه ولا ينبغي له أخذ الجعل ، ومن عجز عن الخروج وله مال ينبغي أن يبعث غيره عنه بماله وعكسه إن أعطاه الإمام كفايته من بيت المال لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلا ، وإذا قال القاعد للغازي : خذ هذا المال لتغزو به عني لا يجوز ؛ لأنه استئجار على الجهاد بخلاف قوله : فاغز به ومثله الحج وللغازي أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله ؛ لأنه لا يتهيأ له الخروج إلا به. رد المحتار، كتاب الجهاد

অনুবাদ: "বিশেষভাবে উল্লেখ্য: যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদ করতে সক্ষম তার জন্য নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা আবশ্যক হবে। তার জন্য পারিশ্রমিক নেয়া উচিত নয়। আর যে নিজে জিহাদে বের হতে সক্ষম নয়, কিন্তু তার মাল-সম্পদ আছে, তার জন্য উচিত, সে নিজের মাল-সম্পদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকে জিহাদে পাঠাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে ইমাম বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খরচ দিল তার জন্য অন্য কারও থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয নেই। অক্ষম ব্যক্তি যখন যোদ্ধাকে বলবে, তুমি আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার জন্য এই মাল নাও, তাহলে তা জায়িয হবে না। কেননা এটা জিহাদের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হয়ে যাবে। এরই বিপরীত যদি বলে, এই মাল নাও এবং তা দিয়ে যুদ্ধ কর। অনুরূপ মাসআলা হজের ক্ষেত্রেও। আর যোদ্ধা তার খরচের কিছু অংশ পরিবারের খরচের জন্য রেখে যেতে পারবে। কেননা এটা ছাড়া সে জিহাদে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না।" -রাদ্দুল মুহতার, কিতাবুল জিহাদ

ফিকহে ইসলামীর এ বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে, জিহাদের অর্থবলের মূল মাপকাঠি হচ্ছে, মুজাহিদের নিজস্ব সামর্থ্য। যার উপর জিহাদ ফরয তার উপর জিহাদের জন্য নিজের সম্পদ খরচ করাও ফরয। এমনকি শারীরিক ওজরের কারণে বা অন্য কোনো শরয়ী ওজরের কারণে যে নিজে জিহাদে শরীক হতে পারবে না, সে তার নিজের মাল-সম্পদ দিয়ে অন্য কাউকে জিহাদে পাঠানো তার কর্তব্য।

সীরাত ও ফিকহের বক্তব্য থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে, একজন মুজাহিদ তার পরিবারের জরুরি খরচের ব্যবস্থা করার পর বাকি সম্পদ থেকে জিহাদের জন্য জরুরি পরিমাণ খরচ করা তার দায়িত্ব। অর্থবলের জন্য সামষ্টিক কোনো অর্থব্যবস্থা থাকা জরুরি নয়, বা জিহাদের জন্য তা শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসলমানদের বাইতুল মাল গঠিত হলে সেখানে থেকে ক্ষেত্রবিশেষে খরচ করা হবে, কিন্তু জিহাদের মূল খরচ বহন করবে খোদ মুজাহিদ।

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল

জিহাদের ক্ষেত্রে অস্ত্রবল একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এবং একটি মৌলিক উপাদান। কুরআন-সুন্নাহতে এ বিষয়ে আমরা যে নির্দেশনাগুলো পাই তা হচ্ছে যথাক্রমে:

১. অস্ত্রের উপাদান আল্লাহ প্রদত্ত একটি নিয়ামত।

২. অস্ত্র তৈরি মুসলমানদের উপর অর্পিত একটি ফরয দায়িত্ব।

৩. অস্ত্র তৈরি একটি ফযীলতপূর্ণ আমল।

৪. অস্ত্র তৈরি মুসলমানদের ব্যক্তিগত একটি আমল।

৫. অস্ত্র প্রশিক্ষণ মুসলমানদের ব্যক্তিগত একটি দায়িত্ব।

আয়াত ও হাদীসগুলোর উপর একটু ধারাবাহিক নজর বুলিয়ে নিন।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)سورة الحديد

অনুবাদ: "আমি অবশ্যই রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সঙ্গে কিতাব ও ন্যায়দণ্ড পাঠিয়েছি। যাতে করে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর তাদের জন্য আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মাঝে বিপুল রণশক্তি ও মানুষের বহুবিদ উপকার আছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করতে চান, কে না দেখেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আল্লাহ প্রচণ্ড শক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী।" -সূরা হাদীদ ৫৭:২৫

আয়াতের وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ অংশের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন-

أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه؛ ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين، وبيان وإيضاح للتوحيد، وتبيان ودلائل، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف، وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده.

অনুবাদ: "অর্থাৎ দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও যারা সত্যের বিরোধিতা করবে তাদের প্রতিরোধের জন্য আমি লোহাকে বানিয়েছি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পর মক্কায় তেরো বছর অবস্থন করেন, যখন তাঁর উপর মক্কী সূরাগুলো অবতীর্ণ হতো, যেগুলোতে মুশরিকদের সঙ্গে যুক্তি -তর্ক এবং তাওহীদকে স্পষ্ট করার দলীল

প্রমাণের বিবরণ ছিল। এরপর যখন বিরোধীদের সামনে দলীল পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা হিজরতের বিধান দেন, তাদেরকে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করার আদেশ দেন। যারা কুরআনের বিরোধিতা করল, কুরআনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল এবং তার বিরোধিতা করল তাদের ঘাড়ে ও মাথায় আঘাত করতে আদেশ করেন।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به وقال ارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق.

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

قال ابو عيسى وفي الباب عن كعب بن مرة و عمرو بن عبسة و عبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله

অনুবাদ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা একটি তীরের উসিলায় তিন জনকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তার কারিগর যে তা বানিয়ে নেকের আশা করে, তীর নিক্ষেপকারী এবং যে তা এগিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং বাহনে আরোহণ কর। কেননা, তোমাদের তীর নিক্ষেপ করা আমার কাছে আরোহণ করার চেয়ে উত্তম। কোনো মুসলমান যা দিয়ে খেলাধুলা করে তার সবই অসার, তবে ধনুক দিয়ে তীর মারা, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ

দেয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে খেলা করা ব্যতীত। কেননা, এগুলো হচ্ছে হক-দায়িত্ব।" -সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপের ফযীলত অধ্যায়

এ হাদীসে অস্ত্র তৈরি, অস্ত্রের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ব্যবহারের প্রতিটি পর্বে যার যা করার সামর্থ্য আছে তা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং শরীয়তের পাওনা হক।

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى المسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جدارا.

قال أبو عيسى وفي الباب عن ابي هريرة و جابر و عائشة و أنس وهذا حديث صحيح غريب من حديث الثوري. سنن الترمذ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق

অনুবাদ: "ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীর্ণ-শীর্ণ ঘোড়াকে 'হাফয়া' থেকে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করান, যার দূরত্ব হচ্ছে ছয় মাইল। আর যে ঘোড়া জীর্ণ-শীর্ণ পাতলা নয় সেগুলোকে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' থেকে 'মসজিদে বনি জুরাইক' পর্যন্ত প্রতিযোগিতা দেন। যাদেরকে তিনি ঘোড়দৌঁড়ে পাঠান আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তখন আমার ঘোড়া আমাকে নিয়ে একটি দেয়াল টপকে পার হয়ে যায়।" -সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, রিহান ও প্রতিযোগিতা অধ্যায়

ঘোড় দৌড় এবং ঘোড়ার এ প্রতিযোগিতার পেছনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেধা ও সময় ব্যয় করেন, কারণ তা জিহাদের উপাদান। জিহাদের অস্ত্রবল, যা অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব।

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق

অনুবাদ: "আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিযা, উট ও ঘোড়া ছাড়া আর কোনো কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।" -সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, রেহান ও প্রতিযোগিতা অধ্যায়

অস্ত্র ও যুদ্ধের উপাদানগুলোর প্রস্তুত ও ব্যবহার শেখা মুসলমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। যে প্রতিযোগিতা শরীয়তে কাম্য কোনো বিষয় নয়, সে প্রতিযোগিতাকে শুধু এ জন্যই বৈধতা দেয়া হয় যেন প্রতিটি মুসলমান অস্ত্রের ব্যবহার শিখতে পারে এবং কুফরী শক্তির মোকাবেলা করার জন্য যেন নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলে।

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله هي له أجر لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا وفي الحديث قصة.

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا. سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله

অনুবাদ: "আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লিখিত আছে। ঘোড়া তিন ধরনের। এক শ্রেণির ঘোড়া তার মালিকের জন্য সাওয়াবের উসিলা, একশ্রেণির ঘোড়া তার মালিকের জন্য পর্দাস্বরূপ, আরেক শ্রেণির ঘোড়া তার মালিকের জন্য বোঝাস্বরূপ। এর মধ্যে যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সাওয়াবের উসিলা, তা হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে সে

আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য পালে, তা তার জন্য সাওয়াবের উসিলা। তার পেটে যা কিছুই যায় তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য সাওয়াব লিখেন। হাদীসে একটি ঘটনা আছে।" -সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখার ফযীলত অধ্যায়

এ সামরিক যান প্রতিটি মুসলমান তার নিজ দায়িত্বেই সংগ্রহ করবে এবং তার পরিচর্যা করবে।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) سورة الأنفال

অনুবাদ: "তাদের (কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) জন্য তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখ এবং তা দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দাও। এমনিভাবে তারা ব্যতীত আরও কিছু মানুষকে যাদেরকে তোমরা চেনো না, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের উপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না।" (সূরা আনফাল ০৮:৬০)

সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটি আরও সুস্পষ্ট-

عن عقبة ابن عامر ضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله علي وسلم: من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو قد عصى. صحيح مسلم، كتب الجهاد، باب فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه

অনুবাদ: "উকবা ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ করে অতঃপর তা ছেড়ে দেয় বা ভুলে যায়, সে

আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা বলেন, তাহলে সে অবাধ্যতা করল।" -সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه

কুরআন-হাদীস এবং মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তির অস্ত্রবলই জিহাদের অস্ত্রবল হিসাবে বিবেচিত। আর ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য তার অস্ত্রবল হিসেবে বিবেচিত হবে। সম্মিলিতভাবে কোনো অস্ত্রভাণ্ডার থাকলে সেখান থেকে মুজাহিদগণকে সহযোগিতা করা হবে। তবে না থাকলে ব্যক্তির সামর্থ্যের ভিত্তিতে জিহাদের ফরয বিধান আপন জায়গায় বহাল থাকবে। তবে বিশেষ মুহূর্তে কোনো মুজাহিদ নিরস্ত্র হয়ে কোনো সশস্ত্র শত্রুর সামনে পড়ে গেলে তার জন্য পালিয়ে আসার অনুমতি আছে। এটি একটি ভিন্ন বিষয়। জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য অস্ত্রের সামর্থ্য একটি ভিন্ন বিষয়।

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল

সামর্থ্যের আলোচনায় কৌশলবল একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয়। বিষয়টি আমাদের মনের মাঝে এভাবে জমে আছে যে, বিশ্বের মুসলমানদের অর্থ, শক্তি, ভূমি ও জনবল সবকিছুকে বিশ্ব কুফরী শক্তি এমন কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে, যা থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যেহেতু আমাদের অর্থ, জনবল, অস্ত্রবল ও ভূমির মাঝে সমন্বয় করতে পারছি না। আমাদের জনবলকে শত্রুপক্ষ বহুধা বিভক্ত করেছে, তাদের মাঝে এমন দেয়াল বানিয়েছে যে দেয়াল টপকে আমাদের জনবলকে একীভূত করা সম্ভব নয়। আমাদের মুসলিম বিশ্বের অর্থগুলোকে তারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে যে,

তা আমরা আমাদের মতো করে খরচ করতে পারি না। আমাদের অস্ত্রের উপর তাদের এমন নিয়ন্ত্রণ আছে, যা থেকে আমরা বের হতে পারছি না।

এ কথাগুলো আমরা আমাদের মনের মাঝেও জিইয়ে নিলাম। বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞের মতো কথাগুলো আমরা বলেও থাকি।

এ ক্ষেত্রে সত্য কথা হচ্ছে, যে বিষয়গুলো আমাদের মুখে আসতে লজ্জিত হওয়ার কথা, সেগুলো আমরা গর্বের সঙ্গে বলে বেড়াই। স্বভাবগতভাবে কুফরী শক্তিকে কৌশলের মেধা বেশি দেয়া হয়নি। মুসলমানদেরকে কৌশলের মেধাও দেয়া হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কৌশল শেখানোও হয়। শত হাজার বছর যাবত সে কৌশলের অনুশীলন হয়। যে পর্বে এসে মুসলমান চলমান সে কৌশলটিকে ব্যবহার করা ভুলে যায় এবং তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা ছেড়ে দেয়, সে পর্ব থেকে মুসলমানদের অপরাধের পর্ব শুরু হয়। যতদিন পর্যন্ত সে কৌশলকে তারা আবার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে না আসবে ততদিন পর্যন্ত তাদের অপরাধের মাত্রা বাড়তেই থাকবে। এটি হচ্ছে একটি কথা।

আরেকটি কথা হচ্ছে, মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকে বাহ্যত শয়তানের কৌশলগুলোই বেশি শক্তিশালী ছিল। কিন্তু বাস্তবিকভাবে শয়তানের কৌশল কখনও শক্তিশালী ছিল না।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦) سورة النساء

অনুবাদ: “যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা

শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল"। সূরা নিসা- ০৪:৭৬

কুরআনের এ ঘোষণার বাস্তবতাকে মুসলমান স্বীকার করতেই হবে। কুফরী শক্তির কৌশলকে একটি ওজর হিসাবে দাঁড় করানোর অর্থই হচ্ছে কুরআনের এ আয়াতকে বিশ্বাস না করা। আমরা আমাদের অবহেলা ও হেয়ালিপনায় এমন কিছু বলে ফেলি যা আমাদের ঈমানকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। আল্লাহ হেফাযত করুন।

সামর্থ্যের চার দিক ও আমাদের বর্তমান অবস্থা

সামর্থ্যের যে দিকগুলো নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হল সেগুলোর সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থাকে এবার একটু মিলিয়ে দেখতে পারি। সামর্থ্যের চারটি দিক আবার একটু স্মরণ করুন। জনবল, অর্থবল, অস্ত্রবল ও কৌশলবল। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা, মুসলিম বিশ্বের সশস্ত্রবাহিনী, তেল-সোনার খনির অধিকারী অনেকগুলো মুসলিম দেশের উপস্থিতি, পারমাণবিক অস্ত্রসহ বিশাল অস্ত্রভাণ্ডারের অধিকারী অনেকগুলো মুসলিম দেশের উপস্থিতি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কুরআন-হাদীস ও ফিকহে ইসলামীতে বিবৃত বিশ্বব্যাপী জিহাদ পরিচালনার কৌশলগুলো চর্চা এখনও আমাদের পঠিত কিতাবাদিতে সচল আছে, যা আমাদের চোখের আড়াল হওয়া সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় আমরা সামর্থ্যের কোন্ দিকের ব্যাপারে বলতে পারি যে, আমাদের সামর্থ্য নেই?

আমার উত্থাপিত এ প্রশ্নটির অনেকগুলো সহজ উত্তর আছে, যে উত্তরগুলো আমরা বিগত অনেক যুগ যাবত চর্বণ করে চলেছি এবং নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত মনে করার জন্য যথেষ্ট মনে করে আসছি।

আমি এখন সে সহজ উত্তরগুলো উল্লেখ করব এবং তার উপর কিছু সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করে সে বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্তগুলো জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সহজ উত্তর-১: বিশ্বে দেড়শত কোটি মুসলমান থাকলেও তাদের পরস্পরে ঐক্য নেই। এ সংখ্যা দিয়ে মুজাহিদের সংখ্যা বিচার করলে ভুল হবে। এ ধরনের মুসলমানদের সংখ্যাকে সামনে রেখে জনবলের সামর্থ্য আছে বলা যায় না। অতএব জনবলের বিবেচনায় সামর্থ্য নেই, এটাই বাস্তবতা।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: শরীয়তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক মুসলমানের উপস্থিতি থাকলে তাদের উপর জিহাদ করা ফরয। জনবলের সামর্থ্য আছে, এটাই বলা হবে। মুসলমানরা নিজেদের পরস্পরের ঐক্য বিনষ্ট করে জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। এটি কোনো ওজর নয়। এটা হচ্ছে প্রথম কথা।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, 'ঐক্য নেই' কথাটি ঠিক নয়। কারণ আমাদের দেশে এবং চলমান এ পৃথিবীতে বিভিন্ন শিরোনামে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জামাআত আছে। একই ব্যক্তির অনুসরণে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐক্য আছে। একই ব্যক্তির আদেশ-নিষেধ মানার মতো হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে। কমপক্ষে বারো হাজার মুসলমানের ঐক্যের উদাহরণ এ দেশে ও এ পৃথিবীতে এক দুটি নয়। এর উদাহরণও হাজার হাজার আছে।

এমন অসংখ্য মুহতামিম আছেন, যাঁদের হাজার হাজার শাগরিদ প্রতিদিন তাঁদের শত শত আদেশ নিষেধ মেনে চলছে। যেসব শাগরিদ তাদের মুহতামিম ও উস্তাদের আদেশ অমান্য করাকে বৈধ মনে করে না; বরং সেসকল মুহতামিম ও উস্তাদগণের আদেশ-

নিষেধ মেনে চলাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য মনে করে থাকেন। তারা তাদের মুহতামিম ও উস্তাদের যে কোনো হুকুমকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

এমন অসংখ্য পীর আছেন যাঁদের লক্ষ লক্ষ অনুসারী প্রতিদিন তাদের প্রতিটি আদেশ নিষেধকে মেনে চলে। তারা তাদের পীরের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করাকে বৈধ মনে করে না। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তারা তাদের পীরের অনুসরণ করাকে জরুরি মনে করে থাকে। তারা পীরের যে কোনো হুকুমকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করতেও সর্বদা প্রস্তুত।

এমন অসংখ্য মুসলিম নেতা আছেন, যাদের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থকরা তাদের যে কোনো আদেশ-নিষেধ শোনার জন্য এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তারা নিজেদের জান-প্রাণ দিয়ে হলেও নেতার হুকুমকে বাস্তবায়ন করে ছাড়বে, এমন মনোভাব তারা সর্বদাই ব্যক্ত করতে থাকে।

এমন অসংখ্য সমাদৃত ব্যক্তি আছেন, যাঁদের যে কোনো নির্দেশনা শোনা, গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়নের জন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান সর্বদা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। যে কোনো আমল করা বা না করা সম্পর্কে প্রশ্ন আসলে তারা সেসকল সমাদৃত ব্যক্তিবর্গের বিবৃতি দিয়ে বলে থাকেন, অমুক করতে বলেছেন তাই আমরা করছি, অথবা অমুক করতে বলেননি তাই করিনি।

এমন অসংখ্য মুফতী মুহাদ্দিস আছেন যাদের ফাতওয়া ও শরয়ী সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত হিসাবে বিশ্বাস করার মতো লক্ষ লক্ষ উলামা ও তালাবা আছেন। তাদের সিদ্ধান্তকে শরীয়তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে মেনে নেয়ার মতো লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান আছে। যাদের ইলমী তাহকীকের উপর দেশের ও বিশ্বের অধিকাংশ

মুসলমানের আস্থা ও বিশ্বাস আছে। অধিকাংশ মুসলমান যাঁদেরকে ইলমী তাহকীকের বিষয়ে আমানতদার মনে করেন।

এমন অসংখ্য সমাজপতি আছেন, যাঁদের অধীনে সমাজের হাজার হাজার মুসলমান পরিচালিত হন। যাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে তারা বাধ্য। যাঁদেরকে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজপতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। যাঁদের অবাধ্যতাকে সমাজের মুসলমানরা বিপজ্জনক মনে করে ।

এভাবে এ দেশে ও সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এমন অসংখ্য ইউনিট ও জামাআত আছে, বিভিন্ন বিষয় ও প্রেক্ষাপটে যাদের সম্মিলিত অবস্থান ও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ এ কথা প্রমাণ করে যে, জিহাদের জন্য যে পরিমাণ লোকবলের ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতি জরুরি সে পরিমাণ লোকবলের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের হাজার হাজার উদাহরণ আছে।

জিহাদের জন্য লোকবলের সামর্থ্যের যে কথা আছে, তা এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এর চেয়ে আরও অস্বাভাবিক কোনো লোক সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং মুসলমানদের এ ধরনের যে কোনো একটি ইউনিট বা একটি জামাআত জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়ের সামর্থ্য রাখে এবং জনবল ও সংখ্যা বিষয়ক কোনো ওজর তাদের নেই।

এ ইউনিট ও জামাআতের বিষয়ে যদি কেউ বলতে চান যে, এগুলোর আভ্যন্তরীণ ঐক্য এতটা মজবুত নয় যে, এদের দ্বারা একটি যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। তাহলে আমরা প্রথমত, বলব এ জামাআতগুলোর অনুসারী ও অনুসৃত কেউ এমন দাবি করেন না; বরং তাদের পরস্পর ঐক্য অনেক বেশি মজবুত ও সুদৃঢ় বলেই তারা দাবি করে থাকেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, জিহাদের দায়িত্বটি

ফরয হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এর চেয়ে আর বেশি কিছু শরীয়ত দাবি করে না। এরপরও যদি কেউ এগুলোকে ওজর হিসাবে উপস্থাপন করতে চায় তাহলে তারা এ আয়াত থেকে নসীহত গ্রহণ করতে পারেন-

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٤) سورة التوبة

অনুবাদ: "তারা তোমাদের কাছে ওজর পেশ করবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে; (হে নবী) তুমি বলে দাও, তোমরা ওজর পেশ কর না, আমরা কখনও তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দেন, আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়েই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করছিলে।" -সূরা তাওবা- ০৯:৯৪

সহজ উত্তর-২: নামের মুসলমানের লক্ষ কোটি সংখ্যা দিয়ে কী ফায়দা? মুসলমানদের মজবুত ঈমান নেই। দ্বীনের প্রতি তাদের দরদ নেই। অত্মত্যাগের মানসিকতা নেই। অতএব এমন নামের মুসলমানদের সংখ্যা গণনা করে জিহাদের মতো একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেয়া যায় না।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: 'নামের মুসলমান'দের উপরই শরীয়তের প্রতিটি বিধান অপরিহার্য করা হয়। যে বিধানগুলো পালন করতে করতে তারা 'কামের মুসলমান' (সত্যিকার মুসলমান) হয়ে যাবে। নামের মুসলমান যদি মুসলমান না হয়ে থাকে, তাহলে তারা কাফের,

তাদের সঙ্গে মুসলমান সুলভ কোনো আচরণ করার সুযোগ নেই। আর যদি নামের মুসলমানরা মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তাদের উপর শরীয়াতের সকল বিধান বর্তাবে এবং তাদেরকে নিয়ে দ্বীনের ইজতিমায়ী-সম্মিলিত সবগুলো কাজ করতে হবে।

এক সময় মুসলমানদের মজবুত ঈমান থাকবে না, তাদের আত্মত্যাগের মানসিকতা থাকবে না, দ্বীনের প্রতি কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ দরদ থাকবে না -এসকল হালাতকে সামনে রেখেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যোদ্ধাদের সংখ্যার বিষয়ে বিধানে শিথিলতা দান করেন। দশগুণ কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ফরয বিধান ছিল। পরে দ্বিগুণ কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিধান দেয়া হয়। যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্তরের সকল পর্যায়ের মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য।

নামের মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের নিজেদেরকেও এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কি মুসলমান? না কাফের? তাদের ব্যাপারে আমাদেরকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কি মুসলমান? না কাফের?

তারা যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বগুলো তাদেরকে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে এবং আমাদেরকেও তাদের কাছ থেকে ঐ দায়িত্বগুলো আদায় করতে হবে। আর যদি কাফের হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেন তা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণে আনতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা হলে এ আয়াতের মর্ম নিয়ে ভাবতে হবে-

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥)سورة البقرة

অনুবাদ: "এবং যখন তারা মুমিনদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা- বিদ্রূপ করে থাকি। আল্লাহ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরার জন্য ঢিল দেন।" (সূরা বাকারা- ০২:১৪-১৫)

সহজ উত্তর-৩: যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তাদের হাতে টাকা নেই। যাদের হাতে টাকা আছে, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নেই। যারা টাকা দিতে প্রস্তুত, তারা যোদ্ধাদের হাতে টাকা পৌঁছাতে সক্ষম নয়। অতএব সব কিছু থাকা অবস্থায়ও সামর্থ্য আছে বলা যাবে না।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, যাদের হাতে টাকা নেই তাদের কর্তব্য, যুদ্ধের জন্য টাকা জোগাড় করা এবং যে টাকা ওয়ালারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নেই তাদের কর্তব্য, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। আর যারা জায়গা মতো টাকা পৌঁছাতে পারছে না, তাদের কর্তব্য, জায়গা মতো টাকা পৌঁছানের রাস্তা খুঁজে বের করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦) سورة التوبة

অনুবাদ: "আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য কিছু আসবাবপত্র তো প্রস্তুত করত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযাত্রা অপছন্দ করেন, এ জন্য তাদেরকে পিছনে ফেলে রাখেন, তাদেরকে বলা হয়, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সঙ্গে বসে থাক।" -সূরা তাওবা ০৯:৪৬

এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, একটি বাহন ও একটি অস্ত্র সংগ্রহ করার মতো সামর্থ্যবান মুসলামানের সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। আমরা ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ যেসকল জামাআতের উদাহরণ উল্লেখ করেছি এমন জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সদস্য এমন আছে যারা কমপক্ষে একটি বাহন ও একটি অস্ত্র সংগ্রহ করার মতো সামর্থ্য রাখেন। তারা এমন অনুসৃতের অনুসারী যে অনুসৃত বলার সঙ্গে সঙ্গে অনুসারীরা লক্ষ কোটি টাকা খরচ করতে কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ করবে না।

এ বিষয়ে তৃতীয় কথা হচ্ছে, বিত্তবানদের সামনে এখনও মুজাহিদদের কাছে টাকা পৌঁছানোর অসংখ্য পথ খোলা আছে। পৌঁছানোর চেষ্টা করার আগেই সম্ভাব্য বাধা ও প্রতিবন্ধকতার চিন্তা করে জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। এক পথে সম্ভব না হলে অন্য পথে যেতে হবে। সে পথে বাধা এলে তৃতীয় কোনো পথে যেতে হবে। অজুহাত খোঁজার কোনো সুযোগ নেই। একজন মরণাপন্ন মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার জন্য আমরা যত জায়গায় যতভাবে ধর্ণা দেই, একটি ফরয দায়িত্ব আদায়ের জন্যও তত জায়গায় ততভাবে ধর্ণা দিতে হবে।

এ বিষয়ে চতুর্থ কথা হচ্ছে, আমরা এখন যেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বলছি, এসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার ইতিহাসও অনেক দীর্ঘ। মুসলমানদের পরস্পরের সহযোগিতার পথে শয়তানের বাধা দেয়া অনেক পুরাতন ইতিহাস। কিন্তু পরস্পরের সহযোগিতা কখনও বন্ধ হয়নি এবং পরস্পরের আদান-প্রদানও বন্ধ হয়নি। প্রত্যেক যুগেই বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল, পাশাপাশি অনুপাতিক হারে সেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারও ছিল। এখনো সেসব বাধা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারও আছে।

অতএব অর্থবলের অনুপস্থিতির ওজরে জিহাদের ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সহজ উত্তর-৪: পারমাণবিক অস্ত্র থেকে শুরু করে ছোট-বড় যত অস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছে আছে। সরকারের কাছে আছে। সেগুলো মুসলমানদের হাতে নেই, মুজাহিদদের হাতে নেই, সাধারণ মুসলমানদের হাতে নেই। অতএব মুসলমানদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র আছে বলে দাবি করার কোনো সুযোগ নেই। এগুলো বরং শত্রুর হাতে আছে।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, জিহাদ ফরয হওয়া ও সামর্থ্য বিষয়ে যেসব আলোচনা করা হচ্ছে সেসব আলোচনার সম্বোধিত ব্যক্তি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালকবৃন্দ ও সরকারও অন্তর্ভুক্ত আছে। রাষ্ট্র পরিচালক ও সরকারের সঙ্গে সরাসরি জড়িত যেসব হাজার হাজার মানুষ আছে তাদের পক্ষে এ ওজর উপস্থাপন করার কোনো সুযোগ নেই যে, অস্ত্রবল সরকারের হাতে। কারণ তারাই সরকার। তারাই রাষ্ট্র পরিচালক। সকল অস্ত্রের পরিচালনা তাদেরই হাতে।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ ওজর যদি সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয় তাহলে দেখার বিষয় হচ্ছে, যে সরকার জিহাদ ফরয হওয়ার পরও জিহাদ করার অনুমতি দেয় না, সে সরকার কাদের সরকার? সাধারণ মুসলমান সে সরকারের সহযোগিতা করবে? না কি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? না কি নীরব থেকে মনে করতে থাকবে, সরকার যা করতে বলবে তাই করতে হবে, এর বাইরে আর কিছু করা যাবে না।

এখানে কথাটি একটু খুলে বলা প্রয়োজন।

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন তা রাষ্ট্র পরিচালকদের উপরও ফরয হয় এবং সাধারণ মুসলিম জনগণের উপরও ফরয হয়ে যায়। রাষ্ট্রপরিচালক সে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করা ফরয; কারণ তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রবল আছে। অতএব রাষ্ট্রপরিচালক যদি নিজে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে সে যুদ্ধে শরীক করে নেয় তাহলে এ ফরয দায়িত্ব খুব সহজেই আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি রাষ্ট্রপরিচালক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধা দেয় এবং মুসলমানদেরকে অস্ত্রবল দিয়ে সহযোগিতা না করে, তাহলে তার বাধা ও অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে জিহাদে যাওয়া মুসলমানদের উপর ফরয।

এ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রপক্ষের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে-

প্রথমত, রাষ্ট্রপক্ষ ও দেশের পরিচালক পক্ষ ধর্মের শিরোনামে ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করে না; এ যুদ্ধকে তারা অবৈধ মনে করে। এ জিহাদকে তারা সাম্প্রদায়িক লড়াই হিসাবে আখ্যায়িত করে। যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। ক্ষেত্রবিশেষে তারা কাফেরদের পক্ষ নিয়ে মুসলিম মুজাহিদদেরকে প্রতিহত করা জরুরি মনে করে।

এর উদাহরণ হচ্ছে বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপক্ষ ও দেশের পরিচালকপক্ষ ধর্মের শিরোনামে ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করে। এমন একটি বিধান ইসলামী শরীয়তে আছে বলে তারা স্বীকার করে। তবে বর্তমানে সে জিহাদের অস্তিত্ব আছে বলে তারা মনে করে না। তারা মনে করে, বিশ্বব্যাপী মুসলমান ও কাফেরদের

পরস্পরে সন্ধি হয়ে যাওয়ার কারণে ধর্মভিত্তিক জিহাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে তারা এ কথাও মনে করে যে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই না করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দ্বীনের কাজ করা যতটা সহজ তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে ততটা সহজ নয়।

এর উদাহরণ হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজতান্ত্রিক কিছু দেশ।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপক্ষ ও দেশের পরিচালক পক্ষ ধর্মের শিরোনামে ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করে। এ ফরয দায়িত্ব তারা তাদের সাধ্য মতো আদায় করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ দায়িত্ব আদায়ের বিষয়ে তাদের প্রস্তুতি আছে। প্রস্তুতির ধারাবাহিকতা চালু আছে। আন্তর্জাতিক শত্রুপক্ষ তাদের শত্রুতার অনুশীলনের জন্য বিশ্বব্যাপী কোথায় কী করছে? কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? সেসব তথ্য সংগ্রহের পেছনে তাদের জাগ্রত দৃষ্টি আছে এবং তার প্রতিকারের সাধ্য মাফিক আয়োজনও তারা করছে। বিশ্বের ইসলামী শক্তিগুলোকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর জন্য তাদের ধারাবাহিক ফিকর ও মেহনত চলমান আছে।

এর উদাহরণ হচ্ছে, মানব রচিত আইনের বিরুদ্ধে জিহাদে রত মুজাহিদদের ভূখণ্ডগুলো এবং মুজাহিদদের কাফেলাগুলো।

রাষ্ট্রপক্ষ ও মুসলমান

যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা এ বিশ্লেষণে ঢুকেছি তা হচ্ছে, জিহাদ ফরয হওয়ার প্রশ্নে অস্ত্রবলের বিষয়টি বার বার আমাদের সামনে আসে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রের মজুদ আছে। এর জবাবে বলা হয়, এসব

অস্ত্র রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে আছে, সাধারণ মুসলমানদের হাতে নেই। এ পর্যায়ে এসে আমরা বলতে চাই, মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হওয়ার পর যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অস্ত্র সরবরাহ না করে এবং অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা না করে, তাহলে এ রাষ্ট্রপ্রধান কে? এবং তখন মুসলমানদের করণীয় কী? এ বিষয়গুলো একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। আর সে জন্য বর্তমান পৃথিবীর চলমান অবস্থা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর প্রধানদেরকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

বলা বাহুল্য, এ তিন শ্রেণির মধ্যে প্রথম শ্রেণি হচ্ছে মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধান, যারা জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে মুসলমানদের উপর শাসন করছে। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া, তাদের থেকে বারাআতের ঘোষণা দেয়া মুসলমানদের উপর ফরয। তাদের আনুগত্য, তাদের আইন মানা বা তাদের কোনো প্রকার স্বার্থ রক্ষা করার পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করার কোনো বৈধতা নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণির রাষ্ট্রপ্রধানরা হচ্ছে, যথাক্রমে মুনাফিক ও মুলহিদ। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো শক্তি সামর্থ্য অর্জনের আগ পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের মতো করে জিহাদের প্রস্তুতি নেবে এবং জিহাদের পথে অগ্রসর হতে থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানদের আনুগত্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তৃতীয় শ্রেণির সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন মূলত শরয়ী পরিভাষায় আমীর বা আমীরুল মুমিনীন বা খলীফাতুল মুসলিমীন। এমন রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য সর্বক্ষেত্রে জরুরি। এমতাবস্থায় যদি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, কিন্তু এরপরও কোনো কারণবশত যদি এমন রাষ্ট্রপ্রধান জিহাদের অনুমতি না দেন, তাহলে আমীরের

আদেশ ও নিষেধকে উপেক্ষা করে জিহাদে শরীক হওয়া জায়িয আছে। জিহাদের এ ফরযে আইন আদায়ের মতো শক্তি সামর্থ্য না থাকলে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করা তাদের দায়িত্ব।

সুনির্ধারিত সিদ্ধান্ত লাগবে

এখানে প্রসঙ্গত বলা উত্তম, আমরা যখন এ কথা বলছি যে, আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি/প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তারা কোনো অবস্থায়ই অস্ত্র দিয়ে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করবে না; বরং তাদের বিরোধিতা করবে। তখন আমরা এসকল রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ঐ আচরণ করছি না, শরীয়তের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে যে আচরণ করার কথা আছে।

এখানে আমাদের মুসলিম কর্ণধারদেরকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে- হয়তো তাঁদেরকে বলতে হবে, এসকল রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের তথা ইসলাম ও মুসলমানদের বন্ধু। অতএব তাদের কাছে অস্ত্রের যে সামর্থ্য আছে তা আমাদেরই সামর্থ্য। তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য নেই বলে এ ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

অথবা বলতে হবে, এসকল রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের তথা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু। অতএব তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, তাদের সঙ্গে শত্রুতার ঘোষণা এবং তাদের আনুগত্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। যাতে মুসলিম উম্মাহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে বুঝে নিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতাকে জিইয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই।

থানভী রহিমাহুল্লাহ বিদ্রোহের জন্য, জিহাদের জন্য সামর্থ্য থাকার শর্ত দেন। এ শর্তের পক্ষে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। আলোচনা-পর্যালোচনা কালে সামর্থ্য আছে কি না? তা মূল্যায়ন করা

হয়নি। আর বাহ্যত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা কেন সামর্থ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি? তাও দেখা হয়নি। এমনিভাবে সামর্থ্যগুলো যেখানে যেখানে কুক্ষিগত আছে, যাদের হাতে নিয়ন্ত্রিত আছে, তাদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ কি হবে? তাও দেখা হয়নি।

সহজ উত্তর-৫: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের আয়ত্তাধীন সামর্থ্যগুলোকে বিশ্ব কুফরী শক্তি কৌশলে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। যার ফলে সাধারণ মুসলমানতো প্রশ্নই আসে না, খোদ রাষ্ট্রপ্রধানরাও সে সকল সামর্থ্য নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। অতএব এসব সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে জিহাদ করা যায় না, এ সামর্থ্যকে সামর্থ্য বলা যায় না।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: এ কথাটি কিছুটা মামার বাড়ির আবদারের মতো কথা। শরীয়তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মুসলমানদের হাতে একটি ভূখণ্ড, একটি বিশাল জনগোষ্ঠী, অর্থের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত অস্ত্রের মজুদ থাকার পর তারা সারা বিশ্বের কুফরী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। শত্রুপক্ষের শক্তিশালী কৌশল কখনও কোনো প্রকার ওজর হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কারণ কুফরী শক্তির তুলনায় ইসলামী শক্তির কৌশল প্রত্যেক যুগেই কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল এবং এখনও এগিয়ে আছে। ধাপগুলো যথাক্রমে:

ক. ইসলামী শক্তির হাতে দেড় হাজার বছরের ধারাবাহিক বিজয়ের ইতিহাস আছে, যা কুফরী শক্তির হাতে নেই। যে ইতিহাসে সফলতার সঙ্গে বিশ্ব পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

খ. ইসলামী শক্তির হাতে রাব্বুল আলামীন আল্লাহর দেয়া কৌশল আছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

গ. ইসলামী শক্তির হাতে রাসূল সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে-কলমে দেখানো কৌশলের সচিত্র রূপ আছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

ঘ. ইসলামী শক্তির হাতে রাসূলে আরাবীর দেখানো কৌশলের উপর যে দীর্ঘ অনুশীলন হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ আছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

সর্বোপরি মুসলিম জাতি ও ইসলামের কর্ণধারদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ বাণী চিরসত্য, সর্বকালের জন্য সত্য, সকল প্রজন্মের ক্ষেত্রে সত্য-

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦) سورة النساء

অনুবাদ: "যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে; অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল।" (সূরা নিসা- ০৪:৭৬)

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧) سورة الطارق

অনুবাদ: "নিশ্চয় তারা (কাফেররা) ভীষণ এক ষড়যন্ত্র করে। আর আমিও একটি কৌশল করি। অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।" (সূরা তারিক- ৮৬: ১৫-১৭)

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤) سورة النساء

অনুবাদ: "এবং সে সম্প্রদায়ের অনুসরণে শৈথিল্য কর না। যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তবে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট ভোগ

করে এবং এছাড়া আল্লাহ হতে তোমাদের যে আশা (জান্নাতের) আছে, তাদের সে আশা নেই এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা- ০৪: ১০৪)

পাঁচ. সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কি?

থানভী রহিমাহুল্লাহর উক্তি দিয়ে এ বিষয়ের খুব চর্চা হয় যে, সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ করা যাবে না। আর এ চর্চা পর্যন্তই আলোচনার ইতি টানা হয়। এরপর আলোচনা আর সামনে বাড়েনি যে, জিহাদ করার মতো সামর্থ্য না থাকলে কি করতে হবে? জিহাদ করার মতো সামর্থ্য না থাকা মুসলমানদের জন্য কোনো ফযীলতের বিষয়? না কি এটি একটি অপরাধ? জিহাদ করার মতো সামর্থ্য না থাকলে আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থান করবে? না কি শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে হিজরত করতে হবে? আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে জিহাদ করার সামর্থ্য না থাকলে এবং শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে না পারলে, তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে তুলবে? না কি বন্ধুত্বের প্রকাশ্য ঘোষণা দেবে? তা তলিয়ে দেখা হয়নি।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলেই এ আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ।

শরীয়তের যে বিধানগুলো মুহকাম, অর্থাৎ যে বিধানগুলো মানসুখ-রহিত হয়ে যায়নি; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যে বিধানগুলোর উপর আমল চলতে থাকবে, যে বিধানগুলো ফরযে আইন বা ফরযে কিফায়া এবং যে বিধানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্র পৃথিবী থেকে কখনও শেষ হয়ে যাবে না, আর যে বিধানগুলো বাস্তবায়নের উপর

শরীয়তের আরও অসংখ্য বিধান নির্ভরশীল, অর্থাৎ যে বিধানের উপর আমল না হলে আরও অসংখ্য বিধানের উপর আমল করা যায় না -কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ সেসব বিধানের অন্যতম।

এসকল বিধানের ক্ষেত্রে এমন সম্ভব নয় যে, যুগের পর যুগ পার হয়ে যাবে, শত শত বছর পার হয়ে যাবে, কিন্তু একেক সময় একেক কারণে আমলগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে না। এমনটি হতে পারে না।

ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস বলে, বদর যুদ্ধের তিনশত তেরো থেকে শুরু করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অর্ধ পৃথিবী শাসন এবং খিলাফতে বনু উমাইয়া, খিলাফতে আব্বাসী, উসমানী খিলাফতের বিশ্বব্যাপী শাসন পর্যন্ত কোনো পর্বে কখনও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদের বিধান বাস্তবায়ন না করার কোনো পর্ব আসেনি। মাসআলাগত দিক থেকেও আসেনি এবং বাস্তবায়নের দিক থেকেও আসেনি। মাসআলাগত দিক থেকেও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ সর্বদা ফরয ছিল এবং বাস্তবায়নের দিক থেকেও তা সর্বদা সম্ভব ছিল।

ইসলামী শক্তি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থাকা অবস্থায়ও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর বিধানে কোনো প্রকার শিথিলতা আসেনি, আবার সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী হওয়ার পরও এ বিধান বাস্তবায়ন থেকে মুসলমান অবসর পায়নি।

অতএব এ দাবি করা খুবই যৌক্তিক যে, কোনো অজুহাতেই আমরা কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর ফরয দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাব না। অন্য সব ফরয দায়িত্বের মতো এ দায়িত্বটি আদায় করার ক্ষেত্রেও অনেক হালাত তৈরি হবে, কিন্তু এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির কোনো

পর্ব কখনই আসবে না। সাময়িক অবস্থাগুলোকে স্থায়ী অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করে একটি ফরয দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিল হওয়া এবং তা ভুলে যাওয়ার উপক্রম হওয়া খুবই ভয়াবহ বিষয়। এর পরিণতি অনেক ভয়ংকর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٤) سورة المائدة

অনুবাদ: "আর যারা বলে আমরা নাসারা, আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিই, কিন্তু তাদেরকেও যা কিছু উপদেশ দেয়া হয় তার মধ্যে হতে তারা একটা অংশ ভুলে যায়। সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দেবেন।" (সূরা মায়িদা- ০৫: ১৪)

একটি অকাট্য বিধানকে এভাবে সবাই মিলে অবজ্ঞার সঙ্গে ছেড়ে দিলে তাই ঘটবে যা ঘটার ধমকি আল্লাহ তাআলা দেন এবং তা ঘটছেও। আমরা যখন আল্লাহর দুশমন ও মুসলমানদের দুশমনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ফরয দায়িত্বের কথা ভুলে যাই, তখন আমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে সে অস্ত্রকে শানিত করছি। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই সে অস্ত্রের অনুশীলন করছি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

সামর্থ্য ইত্যাদি না থাকা হচ্ছে একেবারেই একটি সাময়িক হালাত। যার অজুহাতে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ এমনকি শত শত বছর একটি ফরয আমলকে ভুলে থাকা যায় না। এমন একটি আমল থেকে অবসর থাকা যায় না। এ বিষয়ে ফিকিরহীন থাকার যে ধারা চালু হল, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শেষ কথা

সামর্থ্যের আলোচনায় আমরা কথায় কথায় বহু দূর চলে আসি। সামর্থ্য বিষয়ক আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরছি। সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে সামর্থ্যের আলোচনাটি বার বার আসে।

প্রথমত, কাফের রাষ্ট্র ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষেত্রে মুসলিম দেশ ও ইসলামী শক্তির জিহাদ করার সামর্থ্য।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মুরতাদ, মুনাফিক ও মুলহিদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ও ইসলামী শক্তির জিহাদ করার সামর্থ্য।

প্রথম ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরুদ্ধে এবং একটি দারুল হারবের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য একটি মুসলিম দেশের কাছে সামর্থ্যের সব কিছুই আছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মুরতাদ, মুনাফিক ও মুলহিদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য পুরা দেশের জনশক্তি আছে। যে জনশক্তির সামনে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সীমিত জনবল কিছুই নয়। অতএব এখানে সামর্থ্যের শতভাগ উপস্থিতি আছে।

এ পর্যায়ে এসে মনে রাখতে হবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের যে শক্তিগুলো মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ নেবে তারাও মুজাহিদদের বুলেটের লক্ষ্যবস্তু হবে। সেনাবাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ, আদালত ও জনশক্তির যে যে অংশ মুরতাদ সরকারের পক্ষ নেবে তাদের সবার রক্ত হালাল, তারা সবাই মুজাহিদদের বুলেটের লক্ষ্যবস্তু।

অতএব আমাদেরকে দুই কথার এক কথায় আসতে হবে। হয়তো বলতে হবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সরকার ও তার সকল সামরিক শক্তি মুসলমান, অথবা বলতে হবে তারা মুরতাদ। তারা হয়তো ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরদের বুকে বুলেট বিদ্ধ করবে,

নয়তো, তারা মুসলমানদের বুলেট গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এখানে তৃতীয় কোনো স্তর নেই। আমাদের কর্ণধারগণ ও জিম্মাদারগণ বিষয়টিকে সেভাবে চিন্তা করলে অনেক অস্পষ্টতা কেটে যাবে। সামর্থ্যের বিষয়ে যে ধূম্রজাল তৈরি হয় তা ইনশাআল্লাহ কেটে যাবে।

একজন মুসলমান সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় তার দিন রাত কাটাতে পারে না। মুসলমানের প্রতিটি অবস্থার জন্য শরীয়তে সুস্পষ্ট বিধান আছে। আর সফলতার নিশ্চয়তা দেয়া আছে। তাই হতাশ হওয়া, নিরাশ হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া বা গাফিল থাকার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

সামর্থ্যের বাস্তবতাঃ কয়েকটি উদাহরণ

এক. মুরতাদ তাতার রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহ: ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহর ফাতওয়া

وقوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. تفسير ابن كثير، سورة المائدة 50

অনুবাদ: "আল্লাহর বাণী أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ এখানে মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলোর কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানান, যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দূরে সরে থাকে, যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান আছে এবং যা থেকে সমস্ত অমঙ্গল দূরে আছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হুকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা লোকেরা কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নেয়। যেমন জাহিলী যুগের লোকেরা এবং ভ্রষ্ট ও অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক বিধি-বিধান জারী করত। এমনিভাবে যেমন তাতারীরা রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে চেঙ্গিজখানী বিধানের অনুসরণ করত, যে তাদের জন্য ইয়াসাক তৈরি করেছিল। তা ছিল বহুমুখী বিধি-বিধানের সমষ্টি, যা ইহুদী, ঈসায়ী, ইসলাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ থেকে নেয়া হয়। আবার তাতে এমনও অনেক বিধান ছিল যা নিছক নিজেদের মত ও মনষ্কামনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। ফলে সেটি তার সন্তানদের মাঝে একটি অনুসৃত শরীয়ত হিসাবে গৃহীত হয়, যাকে তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া বিধানের উপর প্রাধান্য দিত। তাদের মধ্যে থেকে যারা এমন করবে তারা কাফের, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব; যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের দিকে ফিরে আসে এবং অল্প বিস্তর সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তা দিয়ে ফায়সালা করবে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা মায়েদাহ ৫০)

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর ফাতওয়া:

ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا؛ لأنه عصى الله ورسوله، وكذلك من عنده مماليك كبار، أو غلمان الخيل والجمال والبزاة، أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب،

أو خدم، أو زوجة، أو سرية، أو إماء، فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة، فإن لم يفعل كان عاصيا لله ورسوله، ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين، بل من جند التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين، ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب قتالها، فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا، ولو قالوا: نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا.

ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج، قوتلوا حتى يصوموا رمضان. ويحجوا البيت. ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الربا، ولا شرب الخمر، ولا الفواحش، ولا نجاهد في سبيل الله، ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى، ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. مجموع فتاوى ابن تيمية 51/22، طبعة وزارةالشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام1425

অনুবাদ: "কারও কাছে ছোট্ট গোলাম, ইয়াতীম অথবা সন্তান থাকলে যদি সে তাকে সালাতের জন্য আদেশ না করে তাহলে ছোটকে সালাতের আদেশ না করার কারণে বড়কে শাস্তি দেয়া হবে এবং এ কারণে বড়কে কঠিন শায়েস্তা করা হবে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল। আর যার কাছে বড় গোলাম আছে, ঘোড়া-উট-বাজ ইত্যাদির রাখাল আছে, ঘরের কর্মচারি-ধোপা ইত্যাদি আছে, অথবা খাদিম, স্ত্রী, বাঁদি ইত্যাদি থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তাদের সবাইকে সালাতের আদেশ করা। সে যদি আদেশ না করে তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে। সে মুসলমান সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার পাবে না; বরং সে হবে তাতারী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতারীরা মুখে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে, এরপরও সকল মুসলমানের ঐক্যমতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে যে দলগুলো ইসলামের বিধানাবলী থেকে কোনো একটি বাহ্যিক বিধান বা কোনো একটি আকীদাগত স্বীকৃত বিধানকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করা ওয়াজিব হবে।

তারা যদি বলে, আমরা যাকাত দেব, কিন্তু সিয়াম রাখব না এবং হজ করব না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে যতক্ষণ না তারা রমযানের সিয়াম রাখবে এবং বাইতুল্লাহে গিয়ে হজ করবে। যদি তারা বলে, আমরা এটা করব, কিন্তু আমরা সুদের লেন-দেন ছাড়ব না, মদ পান করা ছাড়ব না, অশ্লীলতা ছাড়ব না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব না, ইহুদী-নাসারাদের উপর জিজিয়া আরোপ করব না ইত্যাদি, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে, যতক্ষণ না তারা তা করে।" (মাজমূউ ফাতাওয়া- ইবনে তাইমিয়া ২২/৫১)

তিনি অপর এক প্রসঙ্গে বলেন-

وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام؛ فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على " باب دمشق " في الغزوة الكبرى. التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه: خصوصا وعموما. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. مجموع فتاوى ابن تيمية 510/27، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام1425هـ

অনুবাদ: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে তাতারীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেন তার সত্যতা তিনি মুসলমানদেরকে দেখান, আর তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে যে আদেশ করেন তার বরকতও প্রকাশ করে দেন। আর তা ছিল এক মহান বিজয়, তাতারী সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করার পর মুসলমরা যেমন বিজয় আর দেখেনি। যে তাতারীরা আহলে ইসলামকে অপদস্থ করে। কেননা তারা হেরে যায়নি; বরং তারা বিজয় লাভ করে যেমনি তারা বড় যুদ্ধের সময় বাবে

দিমাশকে বিজয় লাভ করে। এটা আমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ, যে অনুগ্রহের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অসংখ্য সুন্দর বরকতময় সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যেমন তিনি চান এবং যেমন প্রশংসার উপর তিনি সন্তুষ্ট এবং যা তাঁর দয়াময় ও পরাক্রমশালী সত্তার জন্য উপযুক্ত।" (মাজমূউ ফাতাওয়া- ইবনে তাইমিয়া ২৭/৫১০)

তিনি আরেক প্রসঙ্গে বলেন-

وما كان يقصده أكابر الأئمة العادلين: من جهاد أعداء الله المارقين من الدين وهم صنفان: أهل الفجور والطغيان وذوو الغي والعدوان الخارجون عن شرائع الإيمان طلبا للعلو في الأرض والفساد وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم التتار ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك بالشهادتين أو ببعض سياسة الإسلام. والصنف الثاني: أهل البدع المارقون وذوو الضلال المنافقون الخارجون عن السنة والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة. مجموع فتاوى ابن تيمية 399/28، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام1425

অনুবাদ: "আর দ্বীনত্যাগী আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিষয়ে যে মধ্যমপন্থী বিশিষ্ট ইমামগণ বলেন সেসব দুশমন দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে, পাপাচার, অবাধ্য, ভ্রষ্ট ও ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী, যারা ঈমানের বিধানাবলী থেকে বের হয়ে যায়। যারা পৃথিবীতে প্রভাব প্রতিপত্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। যারা হেদায়াত ও হক পথ ত্যাগ করতে চায়। এরা হচ্ছে তাতারী গোষ্ঠী এবং তাদের মতো যারা ইসলামের বিধানাবলী থেকে বেরিয়ে যায়, যদিও তারা শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে এবং কিছু ইসলামী রাজনীতিকে গ্রহণ করে। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, পথচ্যুত বিদআতী গোষ্ঠী এবং ভ্রষ্ট মুনাফিকগোষ্ঠী যারা সুন্নাত ও জামাআত থেকে বেরিয়ে যায় এবং যারা অনুসৃত পথ ও আনুগত্য থেকে

আলাদা হয়ে যায়।" (মাজমূউ ফাতাওয়া- ইবনে তাইমিয়া ২৮/৩৯৯)

দুই. পরাশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুসলমানদের জিহাদ:

আফগান মুসলমানরা যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন রাশিয়া বিশ্বের প্রধান দুটি শক্তির একটি। সারা বিশ্বের দুটি ভাগের একটি ভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছিল রাশিয়া। বিশ্বের দুটি প্রধান কুফরী শক্তির একটি ছিল রাশিয়া, আর আফগান মুসলমানরা সে শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, জিহাদ করে এবং বিজয় লাভ করে। মুসলমানদের সে বিদ্রোহ ও জিহাদ বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে জিহাদ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। মুজাহিদগণ আল্লাহর পথের মুজাহিদ হিসাবে স্বীকৃতি পান। এ পথে যাঁরা জীবন দেন তাঁরা শহীদ হিসাবে স্বীকৃতি পান।

ইতিহাস বলে, আফগান মুজাহিদগণ যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন তাদের জনবল, অস্ত্রবল ও অর্থবল কোনোটাই এমন ছিল না যাকে তৎকালীন রাশিয়ার সমরশক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়। দশ বছর পর্যন্ত তাঁরা সর্বোচ্চ ক্লাসিনকোভ দিয়ে জিহাদ করেন, একেবারে শেষের দিকে এসে আমেরিকা থেকে তাঁরা কিছু বিমানবিধ্বংসী মিসাইল পান। ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, পারমাণবিক অস্ত্র, লক্ষ লক্ষ সেনা ইত্যাদির কিছুই তাঁদের ছিল না। যখন শত্রুপক্ষের কাছে এসবের সবই ছিল। কিন্তু এরপরও সে জিহাদ বিশ্বের মুসলমানদের কাছে জিহাদের আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

তিন. আমেরিকা ও বিশ্ব কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তালেবানের জিহাদ:

আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব কুফরী শক্তি তালেবানের বিরুদ্ধে বিশ বছর যাবত লড়াই করে, নিজেদের মান-সম্মান, সৈন্য, সামর্থ্য সব হারিয়ে শেষ পর্যন্ত তালেবানের হাতে অপমানজনক আত্মসমর্পণ

করে এখন বিদায় নেয়। এই তালেবান যখন জিহাদের পথে পথ চলা শুরু করে, তখন তাদের সঙ্গ দেয়ার মতো মুসলমানের সংখ্যা একশতও ছিল না। কিন্তু জিহাদের পথে তাদের ধারাবাহিক পথচলা, কুফর শাসিত পৃথিবীতে একটি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা, আমেরিকার নাভি ও মাথায় সাহসী আঘাত, শরীয়তের মানদণ্ডকে শ্রদ্ধা করে একজন আল্লাহর পথের মুজাহিদকে কাফেরদের হাতে তুলে না দিয়ে তার বিনিময়ে জীবন-মরণের ঝুঁকি মাথায় তুলে নেয়া এবং সব শেষে বিশ্ব কুফরী শক্তির গিরায় গিরায় আঘাত করে তাদেরকে আত্মসমর্পণের ঘাটে পৌঁছে দেয়ার গর্বে বিশ্বের মুসলমানরা গর্ববোধ করছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে গর্ব করতে থাকবে এবং একটি আদর্শ হিসাবে তাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে ইনশাআল্লাহ।

এসবই আমাদের সামর্থ্যকে প্রমাণ করে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মুসলমানদের সামর্থ্যের নমুনা এমনই ছিল এবং বিজয়ের উদাহরণগুলো এমনই। অতএব পরিস্থিতি যাই হোক-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অনুবাদ: "তোমরা হীনবল হয়ো না, বিষন্ন হয়ো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান- ০৩: ১৩৯)

শরীয়তের কিছু মৌলিক নীতিমালা:

প্রসঙ্গটি ছিল মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর নামে প্রচারিত দুটি শর্ত। যে দুটি শর্তের ব্যাপক প্রচার করা হয়, সে দুটি শর্ত সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য তালাশ

করার চেষ্টা করি যে, আসলে তিনি এমন কথা বলেছেন কি না? তাঁর যে কিতাবের বরাত দিয়ে শর্ত দুটি প্রচার করা হয় সেগুলোতে শর্ত দুটি সেভাবে পাওয়া যায়নি যেভাবে তাঁর পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়। আর সে বিষয়টিই এ পর্যন্ত বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণকে মনে রাখতে হবে, শরীয়তের একটি মাসআলাকে তাহকীক করার ক্ষেত্রে সালাফের কোনো একজনের একটি ফাতওয়া বা একটি মত প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় আসতে পারে, কিন্তু তা কখনও সিদ্ধান্তের মাপকাঠি নয়। আমাদের সালাফগণ যেমন বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তেমনি সিদ্ধান্তের মাপকাঠিও দিয়েছেন। আমরা যেকোনো মাসআলা তাহকীক কালে সে মাপকাঠিগুলোকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর সেজন্য এখানে শরীয়তের কিছু মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা যেকোনো মাসআলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের সামনে যখন যে মাসআলা আসবে, যখন যে পরিস্থিতি আসবে তখন পারিপার্শ্বিক হালাতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে শরীয়তের যে মূলনীতিগুলোর উপর আমাদেরকে চলতে হবে সেসব মূলনীতির প্রাসঙ্গিক কয়েকটি এখানে সামান্য পর্যালোচনাসহ পেশ করছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শরীয়তের এ মূলনীতিগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

এক. ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যা মূলত সকল মুজতাহিদ ইমাম মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কথা-

إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم, والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم.

فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب –وعدَّد منهم رجالًا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا.

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ابن عبد البر الماكي القرطبي ص:٢٦٤–٢٦٥

অনুবাদ: "আমি আল্লাহর কিতাবে পেলে তাই গ্রহণ করি। আর যদি কুরআনে না পাই তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং সহীহ হাদীসসমূহ গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছেছে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে। আর যদি কিতাবুল্লাহ বা সুন্নতে রাসূলের কোথাও না পাই তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে যার রায় পছন্দ হয় গ্রহণ করি, যা পছন্দ নয় গ্রহণ করি না। কিন্তু তাদের মতের বাহিরে অন্য কারও মত বা রায় গ্রহণ করি না।

আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম নাখয়ী, শাবী, হাসান বসরী, আতা, ইবনে সীরীন ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব পর্যন্ত গড়ায়, তখন আমারও ইজতেহাদ করার অধিকার আছে যেমন তাঁরা ইজতিহাদ করেন। কারণ তাঁরা তো এমন লোকই যারা ইজতিহাদ করে মাসআলা বর্ণনা করেন।" (আল-ইনতিকা পৃ. ২৬৪-২৬৫)

অর্থাৎ, পর্যায়ানুক্রমে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আমল হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি। সমকালীন ও নিকট অতীতের ব্যক্তিবর্গের নির্দেশনা হচ্ছে, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগী।

দুই. যে কোনো কালের মাসাআলায় কিয়াস করে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত শর্তাবলী আরোপ করেন-

شروط صحة القياس خمسة:

أحدها أن لا يكون في مقابلة النص، والثاني أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص، والثالث .....، والرابع .....، والخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه. أصول الشاشي، لنظام الدين الشاشي المتوفى ٣٤٤هـ، ص: ١٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

অনুবাদ: "কিয়াস সহীহ হওয়ার শর্ত পাঁচটি: এক. তা কোনো আয়াত হাদীসের বিপরীত না হতে হবে। দুই. তার কারণে কুরআন হাদীসের কোনো হুকুমে পরিবর্তন আসতে পারবে না। তিন. ...। চার. ...। পাঁচ. উৎসারিত মাসআলার বিষয়ে কোনো আয়াত ও হাদীস না থাকতে হবে।" (উসূলুশ শাশী, নিজামুদ্দীন শাশী রহিমাহুল্লাহ মৃত: ৩৪৪হি. পৃ: ১৯৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন)

যিনি যে ফাতওয়াই দেবেন, যিনি যত শক্তিশালী কিয়াসই পেশ করবেন, সর্বাবস্থায় সে কিয়াস ও ফাতওয়ার ভিত্তিতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না, যা আয়াত ও হাদীসের বিপরীত হয়, বা এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না যার দ্বারা শরীয়তের কোনো হুকুমের বিপরীত কিছু সাব্যস্ত হয়, আর কিয়াস করে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না, যে বিষয়ে আগে থেকে আয়াত বা হাদীস আছে।

কারও ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তের উপর ভরসা করে এ দাবি করা যাবে না যে, তিনি যেহেতু বলেছেন নিশ্চয় তার কাছে দলীল আছে। যে ক্ষেত্রে দলীল থাকা জরুরি সে ক্ষেত্রে দলীল দেখানোও জরুরি। উম্মতের কারও শুধু আমল ও ফাতওয়া এ কথার প্রমাণ নয় যে, তার কাছে দলীল আছে। অথবা তিনি যে আয়াত বা হাদীসের আলোকে আমল করছেন বা ফাতওয়া দিলেন, তা সবার দৃষ্টিতে

দলীল হওয়ার উপযুক্ত হওয়াও জরুরি নয়। তাই সর্ববাস্থায় দলীল প্রমাণ দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

তিন. মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের অনুসরণ সবচেয়ে নিরাপদ এবং হকের নিশ্চয়তা দানকারী। তবে শরীয়তের স্বীকৃত দলীল প্রমাণের বিপরীতে শুধু কোনো ফকীহ-মুজতাহিদের উক্তি-বিবৃতি যথেষ্ট নয়। শরীয়তের স্বীকৃত দলীলের বিপরীতে ফকীহ-মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষের দলীল পেশ করতে হবে।

চার. কোনো মাসআলায় ফকীহ-মুজতাহিদগণ দুই ধরনের সিদ্ধান্ত দিলে পরবর্তী অনুসারীরা সে মতটিকেই অগ্রাধিকার দিবেন যে মতের পক্ষে দলীল শক্তিশালী।

পাঁচ. একটি বিশেষ ভূখণ্ডের জিম্মাদার উলামায়ে কেরাম সে এলাকার সার্বিক অবস্থা বেশি জানবেন এবং শরয়ী কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের ফাতওয়া ও মতামতই বেশি সঠিক হবে। যার দরুন অন্যদের তুলনায় তাঁদের মতামত অগ্রাধিকার পাবে। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যেসব কারণে এলাকার উলামায়ে কেরামের মতামত অগ্রাধিকার পায়, সে কারণগুলো অনুপস্থিত থাকলে, অথবা এলাকার উলামায়ে কেরাম যে অভিমত দেন সে মতের পক্ষের দলীল প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থিত হওয়ার পর যদি বিপরীত মত সামনে আসে এবং বিপরীত মতের পক্ষের দলীল প্রমাণও সামনে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে দলীলের আলোকেই কোনো একটি মত প্রাধান্য পাবে। দলীলের বিপরীতে এলাকার উলামায়ে কেরামের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ছয়. হালাতের পরিবর্তনের কারণে শরীয়তের যে বিধানগুলোতে কোনো প্রকার পরিবর্তন আসার সুযোগ নেই, হালাতের কারণে যেসব মাসআলা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ নেই, আর যেসব হালাত আগেও ছিল এখনও আছে সেসব ক্ষেত্রে হালাতের ওজর পেশ করে বিধান বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই।

সাত. শরীয়তের যেসকল বিধান বাস্তবায়নের পদ্ধতিসহ কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে, সেসব বিধান বাস্তবায়নের এমন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করার কোনো সুযোগ নেই, যে পদ্ধতির সঙ্গে কুরআন-হাদীসে বাতলানো পদ্ধতির কোনো মিল নেই।

আট. শরীয়তে একেক আমল ও দায়িত্বকে একেক নামে উল্লেখ করা হয়। একেক আমল ও দায়িত্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি, পদ্ধতি ও মাত্রা বাতলে দেয়া হয়। অতএব একটি আমলকে আরেকটি আমলের নামে ভূষিত করা এবং একটির হুকুমকে আরেকটির জায়গায় প্রয়োগ করা কুরআন-হাদীসের তাহরীফ তথা বিকৃতির শামিল। কোনো অবস্থায় উম্মতের কারও উক্তি-বিবৃতি দিয়ে তা করা যাবে না।

নয়. বিশ্বের বিশেষ কোনো ভূখণ্ড বা বিশেষ কোনো কাফেলার সিদ্ধান্ত ও ফাতওয়াকে ইজমার মান দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইজমা দাবি করতে হলে শরীয়তের পরিভাষায় যাকে ইজমা বলা হয় এবং যেসব শর্ত পাওয়া গেলে তাকে ইজমার মান দেয়া যায়, সেসব কিছু পাওয়ার পরই কোনো একটি মত বা ফাতওয়াকে ইজমা ভিত্তিক ফাতওয়া বলা যাবে।

বরং কুরূনে মুতাআখখিরা তথা খায়রুল কুরুনের পর থেকে চলমান যামানা পর্যন্ত কোনো ইজমাকে গ্রহণ করতে হলে তা দলীলের

আলোকেই গ্রহণ করতে হবে। খায়রুল কুরূনের পর দলীলের বিপরীতে দলীলবিহীন কোনো ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

দশ. খায়রুল কুরূনের পর থেকে নিকট অতীত ও সমকাল পর্যন্ত উম্মতের কারও কওল-আমল-সুকূত তথা ফাতওয়া-আমল-নীরবতার ভিত্তিতে শরয়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করার চেয়ে কুরআন-হাদীস-সীরাতে সাহাবার ভিত্তিতে শরয়ী কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক বেশি টেকসই ও সহজ। উম্মতের ফাতওয়া-আমল-নীরবতাকে কুরআন হাদীস বোঝার জন্য সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কুরআন-হাদীস-সীরাতে সাহাবার বিপরীতে প্রাধান্য দেয়া যায় না।

এগার. শরয়ী দলীলের আলোকে যা ফরয ওয়াজিব হিসাবে প্রমাণিত হবে, তা সর্বাবস্থায় উম্মতের জন্য কল্যাণকর হবে। লাভ-ক্ষতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এমন দাবি করা যাবে না যে, আমলটি ফরয-ওয়াজিব হলেও এখন এটা উম্মতের জন্য ক্ষতিকর, তাই তা এখন করা যাবে না। এমনিভাবে শরয়ী দলীলের আলোকে যা হারাম প্রমাণিত হবে, তা সর্বাবস্থায় উম্মতের জন্য ক্ষতিকর। লাভ-ক্ষতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এমন দাবি করা যাবে না যে, বিষয়টি হারাম হলেও উম্মতের জন্য তা উপকারী, তাই এখন তা করতে হবে। এমন বক্তব্য ও বিশ্বাস ঈমানকে নষ্ট করে দেবে।

আমাদের করণীয়:

শরীয়তের যেকোনো অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ইস্তিফতা আসলে মুফতীয়ানে কেরাম যে তারতীব ও উসূলের অনুসরণ করে ফাতওয়া দেন, কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ -এর বেলায় সে একই

পদ্ধতি গ্রহণ করা চাই। কুরআনের আয়াত ও তার তাফসীর, হাদীস ও তার ব্যাখ্যা এবং এ উভয়ের ভিত্তিতে মুজতাহিদগণের যে সিদ্ধান্ত সে সিদ্ধান্তের আলোকে মুফতীয়ানে কেরাম ফাতওয়া দেবেন।

দলীলের আলোকে কোনো সিদ্ধান্ত সামনে আসলে তার বিপরীত শক্তিশালী দলীল ছাড়া সে ফাতওয়ার বিপরীত কিছু বলা যাবে না। দলীল ভিত্তিক ফাতওয়ার বিপরীতে তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও বেশি স্পষ্ট দলীলের আলোকে ভিন্ন মত সামনে আসলে তা প্রাধান্য পাবে।

গ্রহণযোগ্য দলীলের আলোকে দুটি ভিন্ন মত সামনে আসলে একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয়ার যেসব স্বীকৃত উপাদান আছে সেগুলোর মাধ্যমে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করব। ব্যক্তিগত সুবিধা, গোষ্ঠীগত সুবিধা, বা যেকোনো ধরনের মনস্কামনার ভিত্তিতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

দলীল নির্ভর দুটি মতের যেকোনো একটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অপর মতটি বাতিল হিসাবে গন্য হবে না। একটি মতকে গ্রহণকারী অপর মত গ্রহণকারীকে কোনো প্রকার গাল-মন্দ করবে না। কুরআন-হাদীসের শত্রু বলবে না। বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করবে না। এ জাতীয় অনর্থক ও খারাপ শব্দ ব্যবহার করলে তা পর্যায়ক্রমে সাহাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আঘাত করে। তাই অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

সত্যকে গ্রহণ করার জন্য বুকটা অনেক প্রশস্ত রাখতে হবে। ইতিহাসের এ পাতাগুলো স্মরণে রাখতে হবে-

حدثنا محمد بن العباس حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي من حفظه قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو

على القضاء فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله قال فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا إلا أني لم أرد هذه إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إذا أرجع وأنا صاغر إذا أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، باب ذكر من اسمه عبيد الله

অনুবাদ: "…. আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, আমরা এক জানাযার সালাতে শরীক হই। সেখানে উবাইদুল্লাহ ইবনে হাসান উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বিচারপতি ছিলেন। জানাযার খাট রাখার পর তিনি বসেন এবং লোকেরাও তার চতুর্দিকে বসে গেল। তখন আমি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করি, তিনি তার ভুল উত্তর দেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে সঠিক বুঝ দিন! এ মাসআলায় সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই এই। তবে এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনাকে এর চেয়ে বড় একটি বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছি। এ কথা বলার পর তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিঁচু করে রাখেন, এরপর মাথা তুলে বললেন, আমি আমাকে ছোট জ্ঞান করে আমার ফাতওয়া থেকে ফিরে আসছি, আমি আমাকে ছোট জ্ঞান করে আমার ফাতওয়া থেকে ফিরে আসছি। বাতিলের মাথা হওয়ার চেয়ে সত্যের লেজ হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।" (তারীখে বাগদাদ, খতীব বাগদাদী, উবাইদুল্লাহ নাম অধ্যায়)

থানভী রহিমাহুল্লাহর দ্বিতীয় কথা: সুস্পষ্ট কুফর

সুস্পষ্ট কুফর ও অস্পষ্ট কুফরের একটি মাপকাঠি শরীয়তের পক্ষ থেকে দেয়া আছে। বলা বাহুল্য, থানভী রহিমাহুল্লাহ শরীয়তের বাতলে দেয়া সে স্পষ্ট কুফরের কথাই বলেন। কোনো একটি কুফর আমাদের কারও কাছে সুস্পষ্ট, আবার কারও কাছে অস্পষ্ট। এর

দ্বারা সুস্পষ্ট কুফর নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ একই কুফর আজ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট মনে হয়, আবার পরের দিন তা অস্পষ্ট মনে হয়।

যেমন থানভী রহিমাহুল্লাহ -এর বক্তব্য অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করে এবং এটা তার নিয়মে পরিণত হয়ে যায়, এমনিভাবে সে যদি গায়রে ইসলামী আইনকে ইসলামী আইনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে এটা সুস্পষ্ট কুফর। কিন্তু আমাদের জিম্মাদারদের অনেকের দৃষ্টিতে এ সুস্পষ্ট কুফর স্পষ্ট হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না; বরং অস্পষ্ট কুফর হিসাবেও তাঁরা তা মানতে রাজী নন। আরেকটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বর্তমান কালের জিম্মাদারগণের বড় একটি অংশ এ সুস্পষ্ট কুফরকে কবীরা গুনাহ হিসাবেও স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। যারা আইনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে গুনাহ করার জন্য বাধ্য করছে এবং যারা গায়রে ইসলামী আইনকে ইসলামী আইনের উপর প্রাধান্য দিয়ে যুগের পর যুগ রাজত্ব করে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাদের জিম্মাদারগণের আচরণ দেখলে বোঝা মুশকিল হবে যে, তাঁরা শাসকদের এ সুস্পষ্ট কুফরগুলোকে কোনো প্রকারের গুনাহ মনে করেন কি না?

তাই বলছি, সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট কুফরের বিষয়টিকে আমাদের প্রথা ও প্রচলনের হাতে ছেড়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কুরআনে, হাদীসে ও ফিকহে ইসলামীতে যে আকীদা-কথা-আমল-আচরণকে সুস্পষ্ট কুফর বলা হয়, সেগুলোই স্পষ্ট কুফর।

থানভী রহিমাহুল্লাহর তৃতীয় কথা: সুস্পষ্ট প্রকাশ

থানভী রহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, যাকে মুরতাদ বলা হবে তার কুফর দেখার মতো নিশ্চিত হতে হবে। শুধু ধারণা নির্ভর বর্ণনার ভিত্তিতে কাউকে মুরতাদ বলা যাবে না। সে কুফরী করেছে বলে যে কেউ বললেই তাকে মুরতাদ বলা যাবে না। সে ঐ কুফরের সঙ্গে জড়িত কি না? তা নিশ্চিত হতে হবে।

থানভী রহিমাহুল্লাহর এ কথাটি একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা। যে বিষয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। সমস্যা হচ্ছে আমাদের বর্তমানকে নিয়ে। থানভী রহিমাহুল্লাহ যে বিষয়টিকে কুফরে সারীহ-সুস্পষ্ট কুফর বলেন সে কুফর আমাদের গণতান্ত্রিক শাসকবর্গ প্রকাশ্যে কোটি কোটি মানুষের সামনে ঘোষণার সঙ্গে গ্রহণ করার পরও সে কুফর তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

শাসকবর্গের প্রকাশ্য ঘোষণা, এ আধুনিক যুগে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে দেশ চালানো সম্ভব নয়। ব্যক্তি, পরিবার, দেশ ও বিশ্বকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে, সকল ধর্মের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্ব, দেশ, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি পরিচালনার কোনো বিকল্প নেই। আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি নিজেকে, তার পরিবারকে, তার সমাজকে পরিচালনা করা অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ দেশের কোটি কোটি মুসলমানকে গায়রুল্লাহর আইন মানতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং আল্লাহর আইন মেনে চলাকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

এই সুস্পষ্ট কুফরের সুস্পষ্ট প্রকাশের পরও থানভী রহিমাহুল্লাহর পতাকাবাহীরা তাঁর উক্তি দিয়েই এই সুস্পষ্ট কুফরকে ঈমান বলে চালিয়ে দিচ্ছে এবং এর সুস্পষ্ট প্রকাশের পরও সে কাফের-মুরতাদকে মুসলিম ও মুমিন বলে আলিঙ্গন করা হচ্ছে।

অতএব কুফরের কোন্ প্রকাশকে সুস্পষ্ট প্রকাশ বলা হবে এবং কোন্ প্রকাশকে অস্পষ্ট প্রকাশ বলা হবে তাও কিতাব থেকেই নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে বর্তমানের প্রভাবে প্রভাবিত, শঙ্কিত, ও তাড়িত ব্যক্তিবর্গের রুচির উপর নির্ভর করার কোনো সুযোগ নেই। যেসব কথা ও কাজে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় তার তালিকা কিতাবাদিতে দেয়া আছে। সে আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

হাজার হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করার পরও যতটুকু কারণে ইবলীস মুরতাদ হয়, ততটুকু কারণে এখনও কোনো মুসলমান মুরতাদ হবে। ইবলীস আল্লাহর শুধু একটি বিধানের ব্যাপারে বলল, 'আমি করব না'। এখন আল্লাহর হাজার হাজার বিধানের ব্যাপারে প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে 'আমি করব না' 'আমরা করব না'। অতএব এখানে এসে বিধান ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। অজুহাতের পথ খুঁজে নিজেকে আড়াল করার পরিবর্তে কাজের পথ খুঁজে বের করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وصلى الله على النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد لله رب العالمين

***